রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৩

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস, ১৫এ,
ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষের এই 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা' বইখানি রবীন্দ্রনাথেব উপর লেখা অতএব রবীন্দ্রনাথের রচনার উদ্ধৃতিপূর্ণ অতএব সুপাঠ্য। শুধু তাই নয়। লেখক উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসরণ করে রামমোহন থেকে শুরু করে তাঁর গবেষণার পদক্রম করে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের উক্তি অবলম্বন করেই তাঁর ধর্মচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তারকবাবু কবি, তিনি কবিতা লেখেন। সেই হেতু বইটির মধ্যে তাঁর নিজের চিন্তার রঙ লাগবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তা হয় নি। তিনি যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ রয়ে গেছেন। এ জন্য বইটির বিশেষ মূল্য।

আর এক মূল্য হ'ল আকার-সংক্ষেপ। আমরা স্বভাবতই বকি বেশি এবং লিখি বেশি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে গেলেও আমাদেরও কলম থামে না। বেশি বেশি লেখা বলেই সে সব বইয়ের আমি নিন্দা করছি না। সে সব বই পড়তে ভালোই লাগে কেননা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে পূর্ণ। তারকবাবু লেখনীকে দাবিয়ে রেখেছেন। বইটির সেই এক বিশেষ মূল্য।

আমি জানি তারকবাবুর বইয়ের সমাদর হবে। তাঁর বইটির প্রথম পাঠকরূপে আমি এই স্বস্তিবাচন করলুম।

শ্রীসুকুমার সেন

মুখবন্ধ

ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক আছে আবার ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যেরও সংযোগ আছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা সম্পর্কে যে আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে তা বিস্তৃতভাবে দর্শনের দিক থেকে করা হয় নি—একান্ত পরিমিতভাবে কয়েকটি ধর্মদর্শনের উল্লেখ বা তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এই মাত্র। সাহিত্য-রসপিপাসুর অন্তরে রবীন্দ্ররচনাবলী তাঁর ধর্মচেতনা সম্পর্কে যে আগ্রহ জাগিয়েছে তাই এই প্রবন্ধের মূল। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্য থেকে তাঁর ধর্মবোধের পরিচয় লাভ করা হয়েছে।

এই আলোচনার সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধে বিষয়বস্তু সন্নিবেশে ইতিহাসের ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার মধ্যে একটা সজীবতা ছিল, যার প্রেরণায় তাঁর ধর্মবোধও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। ক্ষেত্র, বীজ, অঙ্কুর, বিকাশ, ফুল, ফল—এই ছয়টি বিভাগে বিষয়গুলি সাজানো হয়েছে—বৃক্ষের উদ্ভব আর পরিণতির কল্পনাই এই বিভাগের মূল। রবীন্দ্রনাথের বিকাশধর্মী জীবন মহীরূহের সঙ্গেই তুলনীয়।

শ্রীতারকনাথ ঘোষ

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে
পূজার সাজি ভরি,
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকনদুটির মঙ্গলগীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে ॥

সূচীপত্র

ক্ষেত্র

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে ভারতচন্দ্রীয় যুগের আদর্শের অনুবর্তন চলেছে। দেশের মধ্যে আত্মস্থতার চিহ্নমাত্র নেই—নবাবী আমলের অন্তঃসারশূন্য বিলাস আর চটুলতা মারীবিষের মতো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বণিক ইংরেজের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিলেও রাজগৌরব সে যুগের ইংরেজের ছিল না—দেশের মধ্য থেকে যেন তেন প্রকারেণ অর্থনিষ্কাশনই বণিগ্‌বৃত্ত শাসকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সমাজের পুরাতন অভিজাতসম্প্রদায় বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন—কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী অনভিজ্ঞ ইংরেজের সাহায্য নিয়ে বাণিজ্যে বা জমিদারি প্রতিষ্ঠায় সমস্ত অর্পণ করেছে। ইংরেজের রাজ্যশাসনের সুবিধার প্রয়োজনে মধ্যবিত্ত চাকুরে সমাজের সবে উদ্ভব হচ্ছে। অর্থ উপার্জনের পন্থাতেও যেমন পরমুখাপেক্ষিতা, স্বাধীন প্রয়াসের অভাব,—অর্থব্যয়ের প্রকারের মধ্যেও তেমনই পরানুকরণ, স্বাধীন চিন্তাশক্তির অভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জন-জীবনধারাও সে যুগে এই ক্ষয়, এই পঙ্কিলতা থেকে সমাজকে রক্ষা করবার মতো শক্তির অধিকারী ছিল না। পুরাতন আদর্শের বিকৃত রূপের পুচ্ছানুসরণই তখনকার সমাজের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশের মধ্যে কোথাও জীবনীশক্তির প্রবলতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলার জীবনধারায় যে ক্ষয় আরম্ভ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তা যে কী ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, 'নববাবু বিলাস' থেকে সুরু করে 'হুতোম পেঁচার নক্সা' পর্যন্ত এ যুগের অনেক গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রের দুর্বলতা এ যুগের সমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা অবলুপ্ত।

দেশের যাঁরা কর্ণধার-পদবাচ্য, সেই সব ধনী ব্যবসায়ী বা ভূস্বামী অভিজাতবর্গের আচারব্যবহার রুচি-বিকারের চূড়ান্ত নিদর্শন। অবসর-বিনোদনের জন্য যে সব আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা তাঁরা করতেন, তা সমাজমানসে দূষিত ব্যাধির সৃষ্টি করে চলেছিল। মানবীয় প্রবৃত্তির যে আদিম উপাদান শিল্পসাধনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পাবে, তার জঘন্য বিকৃতির ফলে মানুষের চরিত্রের সবলতাই যে শুধু নষ্ট হয়েছিল তা নয়, তার সমগ্র সৌন্দর্যবোধই রাহুগ্রস্ত হয়েছিল। তুচ্ছ উৎসবে প্রচুর অর্থব্যয় কবে ঐশ্বর্য ঘোষণা, বারবধূবিলাস, সাজসজ্জায় আড়ম্বর, বিলাসবাহুল্যের প্রতিযোগিতা —এই ছিল তৎকালীন অভিজাত সমাজের দিনযাত্রার উপাদান, বালখিল্যরাও সমাজের তথাকথিত প্রধানদের আদর্শই অনুকরণ করবার চেষ্টা করত।

সমাজের এই দীনতাব অন্যতম প্রমাণ এ যুগের সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির অভাব। ভারতচন্দ্রের পর আসর জমিয়েছিল তরজা হাফ-আখড়াই আর গোপাল উড়ের যাত্রা। এই সব রচনায় শব্দের আড়ম্বর আর চটকদার কথার পূর্বানুসৃতি ছাড়া আর কিছু ছিল না। স্বাধীন কল্পনা তো এ যুগের কবিদের কাছে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। পূর্বতন কবিদের রচনার রসকে লঘুতর করে সাধারণের কাছে পরিবেশন করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। রচনার মধ্যে রসবস্তুর যে অভাব ঘটত সেটা পূরণ করবার জন্য তাঁরা প্রচুর পরিমাণে রংচঙে কথার মশলা মেশাতেন—মুখ্যত আদিরসই ছিল ঐসব বাক্‌চাতুরির প্রধান উপাদান। সুস্থ জীবনের শ্বাস এই সব রচনার মধ্যে ছিল না, এগুলোর মধ্যে ছিল বিকৃত রুচির কণ্ডূয়ন। যে বৈষ্ণব সাহিত্যে চিত্তের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যেত, সেই সাহিত্য এককালে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছলেও এ যুগে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কেবল অক্ষম অনুকারকের কিছু কিছু রচনা সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন মাত্র করেছিল। মহৎ সাধনার

আদর্শ দূরে থাক, সাধারণ কাব্যগত উৎকর্ষের পরিচয়ও এই সব রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না।

নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতি রচনা করে বাংলার যে ব্রাহ্মণসমাজ একদিন সমাজজীবনের মধ্যে সতেজ কর্মপ্রচেষ্টা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁবা এই যুগে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান সভ্যতাব সংঘর্ষকালে যে-সব আচারের বন্ধনে হিন্দুসমাজকে সুদৃঢ় করে তোলবার ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন, সেই সব আচারের মূল উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হলেও সেগুলো প্রাণহীন নিয়ম হয়ে উঠে সামাজিক জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। যে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণমণ্ডলী বেদান্তদর্শনের তাত্ত্বিকতায় বা ন্যায়দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে এত-দূর মগ্ন হয়েছিলেন যে জীবনের সঙ্গে তাঁদের ভাবনার যোগসূত্র প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এ যুগে সেই বুদ্ধিদীপ্ত পণ্ডিতসমাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। স্মৃতি এ যুগে বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন কবেছিল। অথচ স্মৃতিশাস্ত্র যে মানবসমাজের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন, এ প্রত্যয় এ যুগের পণ্ডিতকুলের ছিল না। সুতরাং জীবনের বেগবান্ ধারাকে সংকীর্ণ আচারের কূপে আবদ্ধ করে রেখে তাঁরা বাঙালীর জাতীয় চরিত্রকে দিন দিন দুর্বল করে তুলছিলেন। অনুপলব্ধ শাস্ত্রের একটা সুবিধামত গোঁজামিল দেওয়া ভাষ্য বা ব্যাখ্যাই জাতীয় জীবনের নিয়ামক ছিল।

সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে এই জীবনাদর্শগত দৈন্য তার ধর্মচর্যাকেও অর্থহীন উপকরণে ভারগ্রস্ত করে তুলেছিল। আচারগত শুচিতা ধর্মনিষ্ঠার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্ম যে রান্নাঘরে ঢুকেছিল বিবেকানন্দের এই মন্তব্য অতিরঞ্জিত আক্রমণ নয়। প্রায় তিনশো বছর আগে মহাপ্রভু প্রেম আর ভক্তির যে আদর্শে সারা বাংলাদেশ প্লাবিত করে দিয়েছিলেন, এ যুগে তার চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। জাতের বিচার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দেশকে সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে বহুধা বিভক্ত করে রেখেছিল। তাঁর অনুত্তম

সাধনার ব্যর্থ অনুকরণে সারা দেশে অজস্র ঠাকুরঘর স্থাপিত হয়েছিল। অধ্যাত্মজীবনের আদর্শের সামান্যতম নিদর্শনও এ যুগে ছিল না। অধ্যাত্মসাধনা—ধর্মচর্যা বলতে বোঝাত কেবল অসংখ্য দেবদেবীর পূজা আর অভ্যাসগত আচার। ধর্মের আবরণে দেশের মধ্যে অজস্র মূঢ়তা প্রশ্রয় পেয়েছিল। তুকতাক মাদুলি কবচ মানতের পরিমাণ ছিল সুপ্রচুর। ধর্মের মোহ যে কী রকম প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে, এ যুগের সতীদাহ আর গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন তার অন্যতম নিদর্শন। দেবতার নামে যে-সব উৎসব করা হত, সেগুলো উৎসবপ্রিয় বাঙালীকে মাতিয়ে তুললেও বিকৃত আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় সেই সব উৎসবের মধ্যে সুস্পষ্ট। যে দেশে ধর্মজিজ্ঞাসার চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, সে দেশে ধর্মের নামে বীভৎস আচারের অনুষ্ঠান সত্যই বিস্ময়কর।

ইংরেজদের সংস্পর্শে আসবার পর থেকে সমাজের সর্বস্তরের এই মানসিক দীনতা দিন দিন বেড়েই চলেছিল—কিন্তু যখন থেকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হল, তখন থেকেই শিক্ষিত সমাজে একটা আলোড়ন দেখা গেল। আত্মপ্রত্যয় বা চিন্তাশক্তির অভাবে বাঙালী তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা তার ধমনীতে নূতন রক্তসঞ্চার করে দিল। কালের অদৃশ্য ইঙ্গিতে বাংলা—সারা ভারতবর্ষই ইংরেজের সংস্পর্শে এসে একটি জিনিস লাভ করেছে—চেতনার নবজাগরণ।

অবশ্য এই ব্যাপার নিতান্ত সহজে হয় নি। ইংরেজ প্রথমে মুখ্যত তার রাজকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্যই এ দেশের কিছু কিছু লোককে ইংরেজীতে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু বিদ্যা-দানের ভার যাঁহাদের হাতে দেওয়া হয়ে থাকে তাঁদের পক্ষে রাজ-পুরুষদের কার্পণ্যের অনুমোদনটুকু বিতরণ করা সম্ভবপর হয় না—সারা জাতিকে ইংরেজী ভাবে ভাবিত করে তোলবার আকাঙ্ক্ষা এ যুগের অনেক পাশ্চাত্য মনীষীর অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল। ফলে

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা করণিকের লেখনী সঞ্চালনের পক্ষে পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন নি, পাশ্চাত্য শিক্ষায়, পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে নিজেদের পরিপূর্ণ করে তুলতে তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন। এই আদর্শের উন্মাদনাটুকু যাঁরা তরুণ ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজের সাহিত্য আর ইতিহাসের শিক্ষক মাত্র ছিলেন না, তিনি তাঁর ছাত্রদের মননশীলতা জাগ্রত করে তুলেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সারা ইউরোপের চিন্তারাজ্যে যে মহাবিপ্লব সাধিত হয়েছিল, তার আদর্শে ডিরোজিও তাঁর প্রিয় ছাত্রদের দীক্ষিত করলেন। ধর্ম আর সমাজের আদর্শ যে নিতান্তই ঝুটা—এ দুটি যে মানুষের ব্যক্তিত্বকে নানা সংস্কারের জালে আবদ্ধ করে রাখছে—ধর্ম আর সমাজের বন্ধন ছিন্ন না করলে যে মানুষের মুক্তি নেই—সেই মতবাদ হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ডিরোজিওর সহযোগিতায় কলেজের ধুরন্ধর ছাত্ররা যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেছিলেন, সেখানে তাঁরা দেশের ধর্মনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ের বিচার করতেন। নিজেদের সমাজের যে ছবি তাঁদের সামনে ছিল, তা তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা জাগায় নি। সমকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের উপর বীতরাগ হতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের দেশের সমগ্র সভ্যতা আর সংস্কৃতির উপর বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা মনেপ্রাণে পাশ্চাত্য আদর্শকে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

বস্তুত এই সময়ে দেশের মধ্যে এমন কোনো প্রতিভাবান লোক-নায়কের আবির্ভাব হয় নি যিনি স্বদেশের ধর্ম বা ইতিহাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এই নবজাত গরুড়কে—ডিরোজিওর ছাত্রদের সদ্য-উন্মেষিত মনুষ্যত্ববোধকে তৃপ্ত করতে পারেন। অপর দিকে খ্রীষ্টীয় মিশনরীরা হিন্দুধর্মের বহিরঙ্গের গ্লানিগুলো রং ফলিয়ে প্রচার

করতে আরম্ভ করে দিলেন। ফলে কেউ কেউ খ্রীষ্টানও হয়ে গিয়েছিলেন। সমাজের কুসংস্কার দূর করবার উৎসাহের প্রাবল্যে এই ছাত্ররা সমাজের সবচেয়ে ঘৃণ্য অনাচারগুলো অনুষ্ঠান করতে প্রবৃত্ত হলেন। গোমাংস ভক্ষণ বা মদ্যপানকে তাঁরা সামাজিক বিপ্লবের সূচনা বলে মনে করে গর্ব অনুভব করতেন। এই বিদ্রোহের আদর্শে অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে পুরাতন সমাজদেহকে আঘাত করে বিপর্যস্ত করবার শক্তি ছিল, কিন্তু নতুন কিছু গড়ে তোলবার সামর্থ্য বা সাধনা ছিল না।

এই ইয়ং বেঙ্গল সমাজের আচার-ব্যবহারে যে আতিশয্য ছিল তা সে যুগের হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা প্রবল বিক্ষোভ বা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে ছিলেন। তাঁদের আচরণে সন্ত্রস্ত হয়ে অনেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের প্রতিবাদও করেছিলেন। তবে এই বিপ্লবাত্মক কার্যধারার ফল যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, সে কথা সে যুগের হিন্দুসমাজের কর্ণধাররা উপলব্ধি করতে পারেন নি। মুসলমানী শাসনের সময় থেকে বাংলার হিন্দুসমাজে যে আত্ম-সংকোচন সুরু হয়েছিল, তা এই সময়ে চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল। সুতরাং তাঁরা এটাকে বাহ্য উৎপাত বলে মনে করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল সমাজের এই অনাচারকে নিন্দার্হ বলে ঘোষণা করলেও এর প্রতিবিধান করবার মতো শক্তি তাঁদের ছিল না—সুতরাং তাঁরা সমাজের মধ্যে আরও কয়েকটা বেড়া দেবার চেষ্টা করে ক্ষান্ত রইলেন।

কালাপাহাড়ি আচরণ সত্ত্বেও ইয়ং বেঙ্গলদের প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় নি—ঐ যুগের তরুণদের মধ্যে আত্মবিচারের একটা প্রবণতা জাগিয়ে তোলাই এঁদের অন্যতম কৃতিত্ব। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে যাঁরা ভেসে গিয়েছিলেন, তাঁদের মনে এ দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতির জন্য কিছুমাত্র মমতা ছিল না।—কিন্তু এ যুগের

যে সব তরুণের মধ্যে স্বদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় বা তার জন্য মমতাবোধ ছিল, তাঁরা এই বিলাতিয়ানার প্রাবল্যে আত্মহারা হন নি—বরং তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিচারবিশ্লেষণের আলোকে নিজেদের সমাজের স্বরূপ দর্শন করতে চেষ্টান্বিত হলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখধাঁধানো বহিরঙ্গ প্রকরণ তাঁদের বিচলিত করল না, পাশ্চাত্য শিক্ষার সার যে সবল যুক্তিবাদ, বাঙালীর মানসক্ষেত্রের উর্বরতা সাধনের জন্য তাঁরা সেই যুক্তিবাদের সাধনা করতে আরম্ভ করলেন।

বস্তুত এই যুক্তিবাদ—প্রবল বিচারপ্রবণতাই এ যুগের ঘুম ভাঙিয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সবল যুক্তির প্রয়োগই বাংলার চিন্তা-ক্ষেত্রে আধুনিকতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ। জ্ঞানের নিকষে জীবনকে বিচার করবার আদর্শ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা আর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে বাঙালীর মানসজগতে এই শক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটল।

এর আগে বাংলার মননের জগৎ নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের ন্যায়চর্চায় তার বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেই কুশাগ্র বুদ্ধি সারা পৃথিবীতে অতুলনীয় হলেও জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নিতান্ত সামান্য। বহির্জগতের সঙ্গে তার সংযোগ না থাকায় সেই জ্ঞানও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রাণহীন হয়ে উঠছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রবাহে সেই নির্জীব জ্ঞান প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মনীষীদের মানসিক জড়তা অপসৃত হল—ভারতের বিদ্যাচর্চা যেন পাশ্চাত্য জগতের বিদ্যাচর্চার সঙ্গে পরিচয়ের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিল। বিশ্বের জ্ঞানপ্রবাহের সঞ্চরণের ফলে তার বহুদিন সঞ্চিত নিশ্চল জ্ঞান সজীব হয়ে উঠেছে।

ইয়ং বেঙ্গল দল অতি উগ্র বিলাতিয়ানার ফলে সমাজ থেকে

বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। হিন্দুসমাজের বা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে তাঁদের মধ্যে সার্থকতার যে সম্ভাবনা ছিল, মধুসূদনের কৃতিত্বে তার পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের অতুলনীয় প্রতিভা ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যে অবগাহন না করলে তিনি বাংলা সাহিত্যের নবযুগ স্বষ্টি করতে পারতেন না। তিনি যে মহাকাব্যের আদর্শ প্রবর্তন করলেন তা অতিমাত্রায় কৃত্রিম; কিন্তু তা-ই বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করল। মধুসূদনের কাব্য যুগান্তকারী সুসাহিত্য, যদিও অননুকরণীয়। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের অনুকরণ সার্থক হয়নি—কিন্তু মধুসূদনের রচনাবলীই আধুনিকতার প্রবর্তন করেছে।

স্বদেশের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন বলেই মধুসূদন সাহিত্য-জগতে যুগান্তর আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু হিন্দুর সমাজ-জীবনের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় মধুসূদন বা ইয়ং বেঙ্গলরা হিন্দু-সমাজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন নি। সে দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীরা—যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করলেও দেশের প্রাচীন ভাবধারা থেকে বিচ্যুত হন নি। এঁরা সমাজের মধ্যে একটা ঘোরতর বিপ্লব আনতে চান নি, সমাজের কুপ্রথা দূর করে সমাজ-দেহকে সুস্থ করে তুলতে অগ্রসর হয়েছিলেন। ধর্মের নামে যে-সব কুপ্রথা বা কদাচার সমাজের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছিল, এই সব সংস্কারকরা সেইগুলোকে অপসারিত করতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁদের মন্ত্র ছিল না, জ্ঞানকে শাণিত করেছিল এইমাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দী বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালীর জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই যুগে বাঙালীর উন্নতির পথ রুদ্ধ হলেও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য জাতির মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক পুষ্ট করে তুলেছিল। মুখ্যত এইজন্যই এ যুগে যে-সব মনীষীর আবির্ভাব

হয়েছিল, তাঁরা সকলেই হৃদয়বান্ ছিলেন। লব্ধ জ্ঞানকে তাঁরা নিষ্ফল হতে দেন নি। সুতরাং এই সময়ে সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সমাজের কুপ্রথা দূর করা বা জ্ঞান প্রচার করাকে অনেকেই জীবনের প্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে দেশের মধ্যে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটা পরিবর্তনের আভাস দেখা গেল।

ইয়ং বেঙ্গলদের অতিশয়িত কার্যকলাপ বা এই সমাজসংস্কারকদের আন্দোলন দেশের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করেছিল। ইয়ং বেঙ্গলদের সমাজ থেকে বার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত— বস্তুত তাঁরা সমাজের বাইরেই ছিলেন; কিন্তু সমাজের মধ্যে থেকে যাঁরা সমাজ সংস্কার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই সমাজের গোঁড়া ধর্মধাররা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র আর প্রচলিত লোকাচার অবলম্বন করে তাঁরা হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা শক্ত রকমের বেড়া তুলে দিতে চেষ্টা করলেন। শুদ্ধমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রেরণায় এই বেড়া ভাঙবার চেষ্টা করলে কী ফল হত বলা যায় না, কিন্তু এ যুগের সমাজসংস্কারকরা প্রাচীন শাস্ত্রের সাহায্য নিয়েই সব বাধা অপসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিধবা-বিবাহকে বিধিসংগত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে শাস্ত্রসাগর মন্থন করতে হয়েছিল। দেশের পূর্বতন জ্ঞানসাধনা থেকে তাঁরা বিচ্যুত হতে চান নি।

এর ফলে দেশের প্রাচীন জ্ঞানসাধনার সঙ্গে নবপরিচয় সাধিত হয়েছে। পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্পর্শে এসে যাঁদের চিন্তাধারা সজীব হয়ে উঠেছিল, তাঁরা নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন বা ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করতে অগ্রসর হলেন। সুতরাং ইয়ং বেঙ্গলদের বিদ্রোহে পুরাতন সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসলেও এঁদের মনীষায় প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হল। একটা গভীর ভাববিপ্লবের ফলে প্রাচীন ভারতের সাধনার যে রত্নগুলি হারিয়ে

গিয়েছিল সেগুলির পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হল। আধুনিক বাংলা সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির স্তব্ধপ্রায় ধারারই একটা বহতা শাখায় পরিণত হল।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞানসাধনার ফলটি গ্রহণ করেছিল বলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সংস্কৃতির অভ্যুদয় হয়েছিল তা দুর্বল হয় নি। প্রাচীন ভারত থেকে মনীষীরা যে সম্পদ লাভ করেছিলেন, তার প্রাচুর্যের সীমা ছিল না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিব মধ্যে যে একটা উত্তম, একটা গতিশীলতা বা চিরচাঞ্চল্যের ভাব আছে, তাও কিছু পরিমাণে লাভ করায় তাঁরা এই প্রাচীন রিক্থ গ্রহণ করবার শক্তিও অর্জন করেছিলেন। ফলে পূর্বতন পণ্ডিতদের মতো তাঁরা অধীত বিদ্যার ভার বহন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, উপযুক্ত কর্ষণায় সেই বিদ্যাকে ফলবতী করে তুলতে অগ্রসর হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের যথার্থ রূপটি যে কী বা তার শাস্ত্রের নির্দেশই যে কী, এই সময়ে সে সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হওয়ায় বহু অর্থহীন সংস্কাব ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

শুধুমাত্র জ্ঞানের আলোচনায় মানুষ তৃপ্ত থাকতে পারে না। মননশীলতা যদি হৃদয়বৃত্তির সংস্পর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তবে তার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলার পণ্ডিত সমাজের জীবনে তাই-ই হয়েছিল। জ্ঞানকে, বিদ্যাকে তাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি—হৃদয়ের সঙ্গে যোগ না থাকায় তাঁদের মননশীলতা সক্রিয় হয়ে ওঠে নি, তাঁদের জ্ঞানসাধনা নির্জীব হয়ে পড়েছিল। যে উপাদানটি এই যুগের অভ্যুদয়ের প্রাণসঞ্চার করেছে, তা আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলেই লাভ করেছি। এই উপাদানটি স্বাদেশিকতা। স্বদেশপ্রেমই ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীকে পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিল।

স্বদেশপ্রেমের মধ্যে যে একটা ভাবাত্মকতা আছে, তা মানুষের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে তুলে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে তাকে

প্রণোদিত করতে পারে। এই একটি হৃদয়বৃত্তিই একাধারে বিপ্লব আর সংগঠনে সমর্থ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেশের মনীষীদের মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তার ফলে তাঁদের মনে বিলাতিয়ানার মোহ সঞ্চারিত হতে পারে নি, অপর পক্ষে স্বজাতির, স্বদেশের জ্ঞানসাধনা বা ধর্মসাধনার দিকে তাঁদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। এই একই অনুপ্রেরণায় তাঁরা অনেকেই সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন—দেশহিতৈষণাকে তাঁরা কর্তব্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

অবশ্য ইংরেজীতে যাকে patriotism বলে, সেই উগ্র দ্বৈপায়ন স্বজাতিপ্রেম সে যুগে ছিল না—সেইজন্য দেশের মধ্যে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয় নি। দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস আদৌ ছিল না এ কথা বলা চলে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্তরালচারী একটা সুগভীর দেশাত্মবোধ এ যুগের মনস্বীদের সমস্ত চিন্তার মূলে থেকে তাঁদের দেশসেবায় প্রণোদিত করেছে। অধুনা দেশ বললে যেমন তার রাষ্ট্রিক সত্তাই মুখ্য বলে প্রতিভাত হয়, সে যুগে তেমন ছিল না। বরং দেশের সংস্কৃতির পুনর্জাগরণই সে যুগে প্রাধান্য লাভ করেছিল। বস্তুত আধুনিক বাঙালী মানসচর্চার ব্যাপারে যতটা উন্নতি লাভ করেছে, জীবনের অন্য অন্য অংশের বিকাশ সে তুলনায় অনেক কম। তাঁর সমাজ-জীবনও তার সাংস্কৃতিক চেতনার চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে।

বাস্তবিক পক্ষে সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির বিচ্ছেদ বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই হয়েছে। মধ্যযুগের শেষভাগ থেকেই সংস্কৃতি আর সমাজ-জীবনের রসায়ন হয়ে ওঠে নি। ফলে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, এমন কি ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও সমাজ-জীবনের সঙ্গে সাধক-জীবনের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সেইজন্যই বাঙালীর সমাজ তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল—পূর্বসূরীদের ধ্যানলব্ধ বাণীও তেজোহীন অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল।

এইজন্যই গত প্রায় দুশো বছরে অনেক ধর্মসাধকের আবির্ভাব হলেও তাঁদের সাধনা সারা দেশের মধ্যে প্রসারিত হয়ে যায় নি। অধ্যাত্মসাধনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল—সাধকরা সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে অধ্যাত্মচিন্তা করতেন।—জনমুক্তির যে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বা এ যুগের অন্য সাধকদের মনে জেগেছে, তা কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে পাওয়া সমাজচেতনারই ফল। ধর্মের উপলব্ধিকে সমাজের মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া, নীতিধর্মের সঙ্গে অধ্যাত্মবোধের মিলন সংঘটন করে সমাজের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করার আদর্শ এ যুগে প্রথম দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এই আদর্শ যাঁরা বরণ করেছিলেন, তাঁদের ধর্মগত মতবাদের মধ্যে সুবিপুল পার্থক্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ধারায় একটা সন্ন্যাসীসম্প্রদায় একদিকে গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে সংস্কারক ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপ্রচেষ্টা স্বতন্ত্র ধারায় চলেছে।

বাঙালীর—শুধু বাঙালীর কেন, সারা ভারতবাসীর মনেই ধর্মপ্রাণতা অনুস্যূত হয়ে আছে। কিন্তু তার ধর্মবোধ একটা সংস্কার—সামাজিক আচার বা অনুষ্ঠানে তা পালিত হতে বাধ্য। সেই আচার-অনুষ্ঠানের মূলগত তাৎপর্য যে কী, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না। ভারতবর্ষে আর্যসমাজ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব বা বিভিন্ন বৈদান্তিকদের ধর্মমতের মধ্যে সুপ্রচুর পার্থক্য এমন কি বিরোধও আছে। কিন্তু ধর্মের সত্যরূপটি সম্পর্কে সাধারণের কোনো ধারণা না থাকায় সেগুলো একই কালে গৃহীত বা পালিত হয়েছে। তত্ত্ব হিসাবে বিভিন্ন ধর্মমতের যে সুবিপুল আলোচনা বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার হয়েছে তা সাধারণের অনধিগম্য। পল্লবগ্রাহী জনসাধারণ ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ধর্মকে স্থান দিয়েছে। বৈদিক অনুষ্ঠান, গায়ত্রীধ্যান, অদ্বৈতবাদ, শ্রীকৃষ্ণের অজস্র লীলা-উৎসব, দুর্গা বা কালীপূজা, কার্তিকপূজা, চড়ক, ইতুপূজা—সবই তার কাছে

সমান মর্যাদা পেয়েছে। ফলে দেশব্যাপী একটা ঘোর তামসিকতার চর্চা হতে পেরেছিল।

এই তামসিকতার উচ্ছেদ সাধন করবার ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা দুটি পথ অবলম্বন করেছিলেন। প্রথম পথ ধর্মকে বিশ্লেষণ করে লোকায়ত ধর্মের আবর্জনা অপসারিত করা—অপর পথটি সমাজ সংস্কার করে ধর্মের একটি সত্য আদর্শ স্থাপন। দুটি ধারার মূলেই ভারতীয় ধর্মসাধনার ঐতিহ্য বর্তমান। কিন্তু প্রথম পথটি যাঁরা অনুসরণ করেছেন, তাঁরা বাঙালীর ভাবরাজ্যে আন্দোলন সৃষ্টি করলেও সমাজকে ধর্মের শক্তিতে জাগাতে পারেন নি, হিন্দু-ধর্মের উর্বর ক্ষেত্রে যে সব আগাছা জন্মেছে সেগুলোকে উন্মূলিত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। অপর পথ যাঁরা অবলম্বন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের নামই সবচেয়ে বেশী উল্লেখ-যোগ্য। তাঁরাও যে সমাজ-জীবনে ধর্মের শক্তি সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন এমন নয়; কিন্তু কয়েকজন অক্লান্তকর্মী মনীষীর প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধর্মের আদর্শ আর সমাজ-জীবনের বিচ্ছেদ বা বিরোধ অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল। আচারের বেড়াজাল থেকে ধর্মকে মুক্ত করে যুক্তির উপরে তাকে স্থাপনা করায় জীবনে তার অনুসরণ সম্ভবপর হয়েছে—বিশেষত এই ধর্ম সমাজের যে অংশে গৃহীত হয়েছে, সেখানে শিক্ষার আলোকসম্পাত হওয়ায় বহু অর্থহীন অনুষ্ঠানকে জীবন থেকে বাদ দেওয়া দুঃসাধ্য হয় নি। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে সমাজের সচেতন সংযোগ রক্ষার আদর্শ এখানে কিছু-পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে।

বীজ

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিদ্রোহী, সমাজসংস্কারক বা ধর্মব্রতীদের প্রয়াসে কর্ষিত বাঙালীর জীবনক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নামে যে মহামহীরুহের আবির্ভাব হয়েছে, এর মূলে রয়েছে বাঙালীর মানস সাধনায় রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবীজ নিক্ষেপ আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনবারিনিষেক। এ যুগের বাঙালীর ধর্মসাধনায় একদিকে যেমন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, অন্যদিকে তার ভাবজীবনের অধ্যাত্মমুখী সাধনার জগতে রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ—এমনই একটা বিকাশের ইতিহাস মহাকালের অদৃশ্য অঙ্গুলিসঞ্চালনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনায় ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি যেমন সবচেয়ে বড়ো কথা নয়, সারা বাংলার চিন্তাজগতে নতুন শক্তি অর্পণই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলনের চরম ফল; তেমনই একটা উপাসক-সংঘ প্রতিষ্ঠা বা তার ব্রাহ্মসমাজে পরিণতি রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, রামমোহনের মনে যে-সব চিন্তা বীজাকারে ছিল তা যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের মধ্য দিয়ে সারা দেশের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, এইটাই এ যুগের ধর্মচিন্তার ইতিহাসে একটা অসামান্য ঘটনা। এই তিনজনের নাম শুদ্ধমাত্র ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে জড়িত করে আলোচনা করলে এঁদের জীবন-সাধনার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে না। একটি বিরাট ভাবসত্তা রামমোহনের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথে সঞ্চারিত হয়ে তা বাঙালীর চিত্তকে মহৎ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

অথচ রবীন্দ্রনাথ আর রামমোহনের মানসিক গড়ন যে একই রকমের ছিল এ কথা বলা চলে না। বরং রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে

নানা অংশে বুদ্ধিজীবিতার বিরুদ্ধ ভাষণ পাওয়া যায়, যা রামমোহনের মানসপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। রামমোহনের ভাবজীবনের নিয়ন্ত্রী তাঁর বুদ্ধি। বাল্যকাল থেকেই প্রচুর গ্রন্থপাঠের ফলে তাঁর বুদ্ধি মার্জিত আব বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবনী পর্যালোচনা কবলে আমরা তাঁব অধ্যয়নের প্রসারের কথা জানতে পারি। অল্প বয়সেই তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ, মূল আরবী ভাষায় কোরান, ফারসী ভাষায় সুফী মতের গ্রন্থও পড়েছিলেন। ষোলো-সতেরো বছব বয়সে তিনি যে পর্যটক-জীবন গ্রহণ করেন, সেই জীবনে অজস্র সংস্কৃত শাস্ত্রেব সঙ্গে তাঁব পরিচয় হয়েছিল। যৌবনে নিজের চেষ্টায় ইংবেজী শিখে তিনি ইংরেজী ধর্মগ্রন্থ বা দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ কবেন। মূল বাইবেল অধ্যয়ন করবাব জন্য তিনি হিব্রু ভাষাও শেখেন।

একটা অনন্যসাধারণ ধীশক্তি না থাকলে এতগুলি গ্রন্থ অধ্যযন করা আব সেই সঙ্গে গ্রন্থগুলি বিচার করে সেগুলির মধ্য থেকে সত্য আকর্ষণ করা সম্ভবপর নয়। রামমোহন তাঁর বিচারপ্রবণ বুদ্ধিকে সদাজাগ্রত রেখেছিলেন। বুদ্ধির কষ্টিপাথরে বিচার করে তিনি যেটাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন, সেটাকে রক্ষা করেছিলেন; আর যেটাকে স্বীকার করতে পাবেন নি, সেটাকে বর্জন করেছিলেন। কোনো সংস্কৃত শাস্ত্রকেই তিনি অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেন নি। তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন, বিচারপ্রবণ বুদ্ধি দিয়ে তার সারটুকু গ্রহণ করে অসার অংশ পরিত্যাগ করেছিলেন। যে সমস্ত গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র বলে পরিচিত, সেগুলোর সবটা গ্রহণ না করে কিছুটামাত্র গ্রহণ করার জন্য তাঁকে হিন্দুসমাজ আর খ্রীষ্টীয়সমাজ দুইয়েরই আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্রের যে অংশ মুখ্যত কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করে লেখা, সে অংশের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যে অংশে পারমার্থিক বিষয় আলোচিত, কেবল সেই অংশটুকু গ্রহণ করার কল্পনা গোঁড়া হিন্দুরা করতে পারেন নি। তেমনই যীশুর

জীবনের আলৌকিক কাহিনীগুলো বাদ দিয়ে বাইবেল থেকে কেবল তাঁর উপদেশটুকু গ্রহণ করার আদর্শও মার্শম্যান-প্রমুখ গোঁড়া মিশনরীরা সহ্য করতে পারেন নি। প্রচলিত ধর্মগ্রন্থকে তথা ধর্মকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার বা বিশ্লেষণ করবার প্রচেষ্টাকে গোঁড়া সমাজ কোনো দিনই স্বীকার বা সহ্য করতে পারে না।

অবশ্য রামমোহন নিছক অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে তাঁর অসামান্য কর্মশক্তির কথা সশ্রদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় ধর্মসাধনার ধারায় রামমোহনের দান কতখানি সে বিষয়ে মতবিরোধের অবকাশ থাকলেও তিনি যে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে বাঙালীর জীবনে নূতন চেতনা সঞ্চার করেছিলেন এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন। দেশের মধ্যে বদ্ধমূল সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদ করবার জন্য তাঁকে অল্প প্রয়াস করতে হয় নি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে সতীদাহ নিবারণের প্রচেষ্টার মূলে পাশ্চাত্য দৃগ্‌ভঙ্গিপ্রভাবিত রুচি আর স্বকীয় সহৃদয়তা থাকলেও তিনি একে কাম্য কর্মমাত্র বলে এর প্রয়োজন-শূন্যতা প্রতিপাদন করে দার্শনিকতার দিক থেকে এর বিরোধিতা করেছিলেন। আবার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় অধিকার থাকা সত্ত্বেও বা প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ অবলম্বন করে আপনার ধর্মবিশ্বাসকে পরিপুষ্ট করে তুললেও রামমোহন তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তাতে তিনি বর্তমান যুগে শুধুমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন যে অনাবশ্যক তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে বিজ্ঞানমূলক ইংরেজী শিক্ষা এদেশে প্রচার করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমন কি তাঁর ধর্মগত ধ্যানধারণার মূলে বেদান্তদর্শনের প্রভূত প্রভাব থাকলেও তিনি বেদান্তকে সমাজবিমুখ শাস্ত্র বলে নিন্দা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানসাধনা, তার বলিষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠা যে বর্তমানে ভারতের পক্ষে শুধুমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান্ তাঁর এই বোধটিই এ দেশের নবজাগৃতির মূল সূত্র।

মানুষের জীবনের আদর্শ যে কী, রামমোহন সে সম্পর্কে ঠিক গুরুর আসনে বসে কোন নির্দেশ দেন নি। 'অনুষ্ঠান, 'ব্রহ্মোপাসনা,' 'প্রার্থনাপত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর মতবাদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁর সমগ্র জীবনগ্রন্থে যে আদর্শটি স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ, সেটি কর্মময় জ্ঞানময় জীবনসাধনার আদর্শ। তিনিও শঙ্করাচার্যের মতোই জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন, কিন্তু 'জ্ঞানকর্মণোর্বিরোধং পর্বতবদকম্প্যম্'—এ মত পোষণ করতেন না। জ্ঞানসাধনায় তিনি যে সত্যকে লাভ করেছিলেন, জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি কর্মের সাধনা করেছিলেন। কিন্তু সেই লব্ধ সত্যকে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবার বা সারা দেশের মধ্যে সেই সত্যানুভূতিকে প্রসারিত করে দেওয়ার অবকাশ তাঁর জীবনে বিশেষ ঘটে নি—সংস্কারমুক্তির সংগ্রামেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছিল। প্রথম যৌবন থেকেই তিনি ধর্মের নামে প্রচলিত নানা কুসংস্কার থেকে সুরু করে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতের সংকীর্ণ অংশের অসারতা প্রতিপন্ন করবার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। শুধুমাত্র দার্শনিকের মতো বা ধর্মপ্রচারের মতো ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মাদর্শ প্রচার করবার প্রয়াস তিনি করেন নি। নানা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন—নানা দিকে তিনি আপনার শক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই বহুধা আত্মনিয়োগের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগরণ সম্ভবপর হলেও তাঁর ধর্মচিন্তা আমাদের জাতীয় জীবনকে তেমন প্রভাবিত করে নি। পরবর্তী-কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হলে হয়তো তাঁর ব্রহ্ম-সাধনার আদর্শ ইতিহাসের পৃষ্ঠাগত হয়েই থাকত।

রামমোহনের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখি যে তিনি হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম বা খ্রীষ্ট ধর্ম—সকল ধর্মের মূলেই যে সাধারণ

সত্য আছে তা স্বীকার করেছেন। যে একেশ্বরবাদকে তিনি ধর্মাদর্শের মূল বলে গ্রহণ করেছিলেন, তা তিনি এই তিন ধর্মমত থেকেই পেয়েছিলেন। এই তিনি ধর্মের মৌলিক সারবত্তা স্বীকার করে, যে-সব অর্থহীন কল্পনা ধর্মকে জটিল বা ভারগ্রস্ত করে তুলছিল, সেইগুলো অপসারিত করবার জন্য তিনি প্রামাণ্য শাস্ত্র থেকেই যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন। সব ধর্মের মধ্যেই যে একটা বিশ্বজনীন আদর্শ আছে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাঁকে হিন্দুর কাছে হিন্দু, মুসলমানের কাছে মুসলমান আর খ্রীষ্টানের কাছে খ্রীষ্টান হতে হয়েছিল। মুসলমানেরা যে তাঁকে জবরদস্ত মৌলবী বলত বা অনেক খ্রীষ্টান যে তাঁকে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান বলে জানত, কোনো ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি তাঁর বিদ্বেষের অভাবই তার কারণ। জাতীয় ভাবের অনুকূল বলেই তিনি প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মসাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন— বস্তুত ব্রহ্মসাধনাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করা উদার খ্রীষ্টান বা মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব বা কঠিনও নয়।

মুখ্যত জ্ঞানসাধক বা কর্মবীর বলে পরিচিত হলেও রামমোহনের হৃদয়ে ধর্মপিপাসা প্রবলই ছিল। অল্প বয়সেই বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়ায় তিনি ধর্মের একটা সার্বভৌম আদর্শের সন্ধান করতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমত আলোচনা করে তিনি সব ধর্মের মধ্যেই যে দুটি মূলের পরিচয় পেয়েছিলেন, 'ব্রহ্মোপাসনা' গ্রন্থে তা বিবৃত করেছেন; একটি 'সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা', অপরটি 'মনুষ্যের মধ্যে সৌজন্য ও সাধু ব্যবহার'। ধর্মের এই মূল দুটির দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মোপাসনার আদর্শটি পুনরুজ্জীবিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এই আদর্শ এমনই অপরিচিত বলে মনে হয়েছিল যে তাঁকে বিধর্মী নাস্তিক বলে তিরস্কার ভোগ করতে হয়েছিল।—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতরা তাঁর ব্রহ্মোপাসনার আদর্শকে বিপর্যস্ত করে সাকার উপাসনার সার্থকতা আর প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করতে অগ্রসর

হয়েছিলেন। কিন্তু রামমোহন স্থির-চিত্তে বিচার করে তাঁর সমস্ত বিরুদ্ধবাদীর যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র উত্তরে তিনি যে-ভাবে ব্রহ্মোপাসনার সার্থকতার কথা বলেছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সাকার উপাসনা ত্যাগ করে ব্রহ্মোপাসনা কেন কর্তব্য তা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণমননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবর্ত না হইয়া রূপ-কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক, পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।" [ঈশোপনিষদের ভূমিকা]—ব্রহ্মজ্ঞান কঠিন সাধনার ধন হলেও তা যে সাধনীয় এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, "যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য তাহার উত্তর এই। যে বস্তু বহু যত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা যত্ন আবশ্যক হয় তাহার অবহেলা কেহ করে না।" [তদেব]

ধর্মজীবনে রামমোহন যে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন সে প্রশ্ন অবান্তর—রামমোহন কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'চারি প্রশ্নের উত্তরে' নিজের সাধনাবস্থার কথা বলেছেন, পরে 'পথ্যপ্রদান' অংশে নিজেকে জিজ্ঞাসু বলেছেন। তাঁর কৃতিত্ব অন্য দিক থেকে বিচার্য। বাংলার তথা ভারতের ধর্মচিন্তার ইতিহাসে তাঁর সবচেয়ে বড়ো দান হল বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা সার্বভৌম ধর্মাদর্শের রূপায়ণ। দাদূ বা কবীরপন্থীদের মধ্যে বা শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে যে নিরাকার ভগবানের উপাসনা প্রচলিত আছে, তিনি তাঁর ব্রহ্মসভায় সেই আদর্শ প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেন। খ্রীষ্টীয় উপাসনার আদর্শ কাছে কিছুটা প্রেরণা

দিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু রামমোহন যত বড়ো জ্ঞানসাধক বা কর্মবীর ছিলেন তত বড়ো স্রষ্টা ছিলেন না। সেইজন্য তিনি উপাসনাকে একটা সুডোল রূপ দিতে পারেন নি। বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ বা কিছু সংগীতেই সে সময়ের উপাসনা সীমাবদ্ধ ছিল। তবে আপনার জ্ঞানদৃষ্টিতে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন আর সর্বশ্রেণীর মানুষকে উদার-ভাবে সেই উপসনায় যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন। ব্রহ্মসমাজের ট্রাস্ট-ডীড পড়লে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়—ব্রহ্মসমাজকে তিনি বলেছেন "a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any name or designation or title peculiarly used for and applied to any particular Being ar Beings by any man or set of men whatsoever."

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে রামমোহনের উত্তরাধিকারী বলা অসংগত হবে না—যদিও দুজনের জীবনে ধর্মসাধনার মূলগত একটা প্রভেদ আছে। রামমোহনের প্রথমে বুদ্ধি তারপর হৃদয়—দেবেন্দ্রনাথের প্রথমে হৃদয় তারপর বুদ্ধি। রামমোহনের ধর্মজীবন সত্যান্বেষণের সাধনা, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবন সত্যানুভবের আকুলতা। দেবেন্দ্র-নাথের অধ্যাত্মজীবনে একটা সুতীব্র আকুলতা ছিল—রামমোহনের জীবনে ততখানি আকুলতা ছিল কি না তাঁর রচনাবলী সে সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু রামমোহন যে ব্রহ্মসাধনার আদর্শটি রেখে গিয়েছিলেন তা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মপিপাসু যুবা হৃদয় একেবারে জয় করে ফেলেছিল।

রামমোহনের সাক্ষাৎ শিষ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দেবেন্দ্রনাথের উপর বেদান্তের কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বটে কিন্তু সে প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। রামমোহন যে ব্রহ্মসাধনার কল্পনা করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেই কল্পনাটিকে আপনার প্রাণরসে জারিত করে আপনার বন্ধুসমাজে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। রামমোহনের সময়ে যা তত্ত্বমাত্র ছিল, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে তা জীবনের সম্বল হয়ে উঠেছে। এই পরিণতির মূলে রয়েছে দেবেন্দ্রনাথের বিকাশধর্মী অধ্যাত্মজীবন।

দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবনের পরিণতির ইতিহাস বিস্ময়কর। হিন্দু কলেজে পড়বার সময় ইউরোপীয় দর্শনের অনুশীলনে তাঁর হৃদয় উদ্বেজিত হয়েছিল—ইউরোপীয় দর্শনের দুটি তত্ত্ব তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল,—'প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব' আর 'যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্যকিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর একটা অবভাস হয়, ইহাই জ্ঞান।' ইউরোপীয় জড়বাদী দর্শনের এই তত্ত্বদুটিকে দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করতে পারেন নি—তাঁর হৃদয় গূঢ়তর সত্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছে 'অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।' এই সময় একটি ঘটনায় তাঁর হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। তাঁর পিতামহীর মৃত্যুর সময় শ্মশানে বসে তাঁর অন্তরে 'এক আশ্চর্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল।' তাঁর এই মনোভাব শ্মশানবৈরাগ্য নয়—এক 'অভূতপূর্ব আনন্দ' তাঁর মন ভরে দিয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে বলেছেন, "তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সব বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন।"—তিনি অন্যত্র বলেছেন যে শ্মশানের সেই আনন্দের সন্ধানেই তাঁর সারা জীবন কেটেছে।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী এই দুটি ঘটনার যে বিশ্লেষণ করেছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "শ্মশানে দেবেন্দ্রনাথের এই যে দ্বিতীয় অধ্যাত্ম উদ্বোধন এও কি আকস্মিক? এরও কি শুধু একটা মৃত্যুর উপরে নির্ভর ছিল? আমার তো তাহা মনে হয় না। সেই যে অল্প বয়সে অনন্ত আকাশ দেখিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধন হইয়াছিল, ভোগবিলাসের আমোদের মধ্যে কিছুকালের মত চাপা পড়িয়া গেলেও অব্যক্ত চেতনলোকে তাহার কাজ নিশ্চয়ই চলিতেছিল। যেমন মৃত্যুর আঘাত পৌঁছিল, অমনি সেই চৈতন্যের অগোচর লোকের গোপন ক্রিয়া গোচর হইয়া সমস্ত চৈতন্যকে এক মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। ভোগস্পৃহা সেই মুহূর্তেই কোথায় ভাসিয়া গেল। এক অননুভূতপূর্ব আশ্চর্য আনন্দ মনে আসিল। বাহিরে অনন্ত আকাশ দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে একদিন অনন্তের উদ্বোধন হইয়াছিল, এখন মৃত্যুর আঘাতে বাহিরের সেই উদ্বোধন, অনন্ত আকাশে তেজোময় অমৃতময় সর্বানুভূ পুরুষের সত্তার সেই আশ্চর্য অনুভূতি, অন্তরে অনির্বচনীয় আনন্দরূপে নূতন করিয়া প্রকাশ পাইল। বাহিরে ইন্দ্রিয়ের স্থূল আবরণের একদিন মোচন হইয়াছিল; অন্তরের স্থূল বিষয়বাসনার আবরণ এখন ছিন্ন হইয়া গেল।"

কিন্তু এই বাহিরে প্রকাশ অন্তরে প্রকাশের মিলিত অনুভূতিকে তাঁর হৃদয় ধারণ করতে পারে নি। অল্পদিনের মধ্যেই সেই শ্মশানে অনুভূত আনন্দকে হারিয়ে ফেলায় তাকে ফিরে পাবার জন্য তিনি কাতর হয়েছেন। এই সময় একটা ঘোরতর বিষাদের ভাব তাঁর সারা অন্তরকে ভরে রেখেছিল—একটা গভীর ঔদাস্য তাঁর ভোগ-প্রবৃত্তিকে অসাড় করে দিয়ে সত্যানুভূতির আকুলতাকে দিনে দিনে পরিবর্ধিত করেছিল।

মনের এই অবস্থাতেই তিনি একটি ছেঁড়া পাতায় রামমোহন-সম্পাদিত ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি দেখতে পান। উপনিষদের

সঙ্গে এই আকস্মিক পরিচয় তাঁর জীবনে একটা বড়ো ঘটনা। উপনিষদের মধ্যে তিনি আপনার অন্তরের অনুভূতিরই প্রতিচ্ছবি দেখলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মাধ্যমে রামমোহনের সাধনার সঙ্গে তাঁর জীবন সংযুক্ত হল।

উপনিষদের মধ্যে তিনি যে জীবনাদর্শের পরিচয় পেলেন, সেটি প্রচার করবার জন্য একটা আকুল আগ্রহ তাঁর মনে জেগেছিল। এর ফলেই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা। তখনও দেবেন্দ্রনাথ আপনার জীবনের সত্যকার অনুভূতিকে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার সুযোগ পান নি—সুতরাং তিনি বিদ্যাবাগীশের কাছে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে শাঙ্কর বেদান্তকে তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। 'আত্মজীবনী'তে শাঙ্কর দর্শন সম্পর্কে তাঁর উক্তিতে তাঁর মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে—"বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না, যেহেতুক তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই, ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায় তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে?"—রামমোহনের প্রকৃত অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, শাস্ত্রকেই তিনি প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছিলেন—শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করেই তাঁর ব্রহ্মসভা স্থাপন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রনির্ভরতার চেয়ে ব্রহ্মধ্যানকেই বড়ো করে দেখেছিলেন; উপাসনার মধ্য দিয়েই ব্রহ্মকে ধ্যান বা লাভ করা যায় এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এইজন্য তিনি হৃদয়ের গভীর ভাবকে উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যে উপাসনা-পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতেন; কিন্তু ব্রহ্ম তাঁর কাছে কেবল ধীশক্তির আধার বলে প্রতিভাত হয় নি। বরং এই মন্ত্র-ধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে ব্রহ্মের আনন্দময় মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে। পরবর্তী কালে তাঁর ধর্মাদর্শে জীবনের রসময় অমৃতময় মূর্তি কল্পনা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে; এই সময়ে সেই আদর্শের

পূর্বাভাস, প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ রূপের অঙ্কুর দেখা যায়।

ধর্মপ্রচারের নবীন উৎসাহে মগ্ন দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এই সময় বাইরের নানা দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত এসেছে। ইংলণ্ডে পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু তাঁকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন করেছিল। সকলের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ অনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ করে তিনি আপনার ধর্মব্রতে নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন। দ্বারকানাথের রাজকীয় চালচলনে তাঁর অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও ঘুণ ধরেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথের সামনে বিপদের পাহাড় নেমে এসেছে। দেবেন্দ্রনাথ তাতে বিমূঢ় হন নি—এই সময় একটা প্রবল বিষয়-বিতৃষ্ণা, সর্বস্বান্ত হয়েও ধর্মপথে চলবার একটা দুর্দম কামনা তাঁকে রক্ষা করেছে। বৈষয়িকতা তাঁর প্রকৃতিগত ছিল না। এই সময় তিনি ঘোর বৈষয়িক বিপদের সমুখে দাঁড়িয়ে যে-ভাবে সংগ্রাম করেছেন তাতে তিনি হৃদয়ের মধ্যে একটা শক্তিও সংগ্রহ করেছিলেন। এই সময়কার রিক্ততার সাধনা তাঁকে বৃহত্তর, মহত্তর জীবনবোধে উত্তীর্ণ করেছে। বাইরের প্রতিকূলতা তাঁর অন্তরে একটা গভীর শক্তি সঞ্চার করেছে।

এর পরই তিনি বেদ আর উপনিষদের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করবার অবকাশ পেয়েছেন। বেদের অপৌরুষেয়তাবাদ নিয়ে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক তাঁকে গৌণভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। যখন তিনি বেদ বা উপনিষদকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার কল্পনা করেছিলেন তখন বেদ বা উপনিষদের পূর্ণতর পরিচয় তিনি লাভ করেন নি, তাঁর হৃদয়ে ব্রহ্মের অনুভূতিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এই সময় 'তাঁহার সমস্ত চৈতন্য পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে ও সান্নিধ্যবোধে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তখন তাঁহার জ্ঞান প্রসন্ন হইল, হৃদয় নির্মল হইল এবং মন তাঁহাতে ধ্যায়মান হইল।' (অজিত. কুমার)—বেদ বা উপনিষদ যে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়, এই বিশ্বাস

তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছে—শাস্ত্রবাক্যের বদলে নূতনতর ভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। অথচ যে উপনিষদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে তিনি আপনার অন্তরের ধ্যানলব্ধ সত্যের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন তাকে তিনি ত্যাগ করতে পারলেন না। আত্মজীবনীতে তিনি সুন্দরভাবে তাঁর এই সময়কার সিদ্ধান্তের বর্ণনা করেছেন,—"বেদে পত্তনভূমি হইল না, উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।"

'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' কল্পনাব মূলে 'জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ'—মুণ্ডকোপনিষদের এই শ্লোকাংশ থাকলেও দেবেন্দ্রনাথে এই সত্যটির অনুভূতি প্রধানত উপনিষদের প্রভাবে হয় নি। দেবেন্দ্রনাথেব এই সত্যানুভূতি কতকাংশে তাঁর পাশ্চাত্য দর্শনপাঠের ফল। অন্তত-পক্ষে পাশ্চাত্য দর্শনে তিনি যে intuition-এর তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানকে মিলিয়ে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য ভাবনার একটা মিলনভূমি রচনার কল্পনা তাঁর মধ্যে পরোক্ষভাবে, হয়তো বা অপবোক্ষভাবেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এ অনুমান করা অসংগত হবে না। যে সত্যকে তিনি লাভ করে-ছিলেন, তাকে প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুই ধারায় বিচার না করে তাঁর চিত্ত সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তাঁর চিত্তের এই বিশেষ প্রবণতাই ব্রাহ্ম-ধর্মের সার্বভৌম আবেদনের প্রধান কারণ।

ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র বা ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচনা 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে'র নিকষে বেদ ও উপনিষদের বিচার।

আবার এগুলিকে উপনিষদের ঋষিদের ভাষায় দেবেন্দ্রনাথের নিজের ব্রহ্মানুভূতির প্রকাশও বলা যায়। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মোপাসনা সম্পর্কে তাঁর সমগ্র ধ্যানধারণা 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের মধ্যে নিহিত আছে। হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর আবেগ সঞ্চারিত হওয়ায় তিনি আপনার ধ্যানলব্ধ অধ্যাত্মবোধকে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্রটি থেকে দেবেন্দ্রনাথের মত বা বিশ্বাসের পরিচয়লাভের প্রচেষ্টা অসংগত হবে না। সমগ্র মন্ত্রটির মধ্যে ব্রহ্ম সম্পর্কে তাঁর বোধ, জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে।

"(১) ওঁ ব্রহ্ম একমিদমগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন আসীৎ। তদিদং সর্বমসৃজৎ।

(২) তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবা-দ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি-সর্বনিয়ন্তৃ-সর্বাশ্রয় সর্ববিৎ-সর্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

(৩) একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভং ভবতি।

(৪) তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

"পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহাকে প্রীত করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।"

ব্রহ্মকে তিনি এক বলে মানতেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞার 'পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না' এই আদর্শটি তিনি জীবনে সর্বতোভাবে পালন করেছিলেন। ব্রহ্মের বোধটি দ্বিতীয় মন্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে—তবে এর সঙ্গে 'স্বাধ্যায়' অংশে

ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপের যে বর্ণনা রয়েছে তা মিলিয়ে পড়লেই তাঁর ব্রহ্মের পরিপূর্ণ বোধটি অনুভব করা যাবে। ব্রহ্মোপাসনাকে তিনি প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি, ব্রহ্মোপাসনার মধ্য দিয়েই মানুষের সব কল্যাণ সম্ভবপর হতে পারে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। চতুর্থ মন্ত্রে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শটি ব্যক্ত করেছেন।

রামমোহনের মতো জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা বলে গ্রহণ করতে দেবেন্দ্রনাথ পারেন নি—তিনি প্রীতির মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম ও জগতের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের আদর্শ যাই থাকুক না কেন, পরবর্তী কালে জগৎ আর জীবন থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সাধনার আদর্শ এ দেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মানুভূতি তাঁকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে নি। "তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়,—তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম; নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫, পৃষ্ঠা ৩০২]

দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে একটা অতুলনীয় রসপিপাসা ছিল—সেইজন্যই তিনি মধ্যযুগের সন্ন্যাসীদের মতো জীবনকে পরিত্যাগ করে সাধনা করতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে জনকের সঙ্গে তুলনা করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে রাজর্ষি আখ্যা দিয়েছিলেন তা অসংগত হয় নি। প্রথম যৌবনে বিষয়ে অনাসক্তি প্রবলভাবে তাঁর অন্তরে জাগ্রত হলেও, ব্রহ্মের অনুভূতি তাঁর জীবনে যতই গভীর হয়েছে জীবনকে তিনি ততই পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সূক্ষ্ম মার্জিত রুচির প্রসঙ্গ তাঁর জীবনীগ্রন্থে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। জীবনের প্রতি একটা মালিন্যহীন গভীর অনুরাগ তাঁর ধর্মচেতনারই অঙ্গীভূত ছিল। "প্রাচীন ভারতের

তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দ-প্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫, পৃষ্ঠা ৫০১]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই রসপিপাসাই বিকশিত হয়ে উঠে তাঁকে অসাধারণ কবিত্ব-সম্পদের অধিকারী করে তুলেছে। পুত্র তাঁর পিতার সম্পদকেই বিকশিত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাসী আহরণী শক্তি ভারতের সমস্ত সাধনার ধারার সারটুকু গ্রহণ করেছে, বিদেশের সম্পদও তাঁর আহরণ থেকে বাদ পড়ে নি, কিন্তু তাঁর মূল প্রকৃতির উপর দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবই সক্রিয়। যে উপনিষদকে রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের স্তন্যদাত্রী বলা হয়, সেই উপনিষদকে তিনি মুখ্যত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' আর তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ জন্মকাল থেকে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের যে জীবন্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা তাঁর অন্তরে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বহু কার্যে ও চিন্তায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর ধর্মানুভূতির মূলে তাঁর পিতৃদেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রামমোহনের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ কী পেয়েছেন তা রামমোহন সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই

ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্যলাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, তাঁর সেই সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।” [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৬, পৃষ্ঠা ৩৮০] এই বিশ্ববোধ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে তেমন বিকশিত হয় নি—রবীন্দ্রনাথ এটা রামমোহনের কাছ থেকে পেয়েছেন। অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মকে অনুভব করবার যে আদর্শ তাঁর বহু রচনায় ব্যক্ত তা দেবেন্দ্রনাথেরই আদর্শ; বিশ্বের ভাবনার সঙ্গে আপনার ভাবনাকে মেলাবার কল্পনা রামমোহনের—এই কল্পনাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধকে বিকশিত করে তুলেছে।

রামমোহন আর দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য এই যে, রামমোহন ধর্মশিক্ষয়িতা, দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসাধক আর রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি। ধর্মানুভূতির প্রকাশ তিনজনের জীবনে স্বতন্ত্রভাবে হয়েছে। কিন্তু তা হলেও এঁদের ধর্মচিন্তাকে একটি সূত্রে গ্রথিত করা যেতে পারে; একটি বীজ থেকে একটি অঙ্কুরই যে উদ্ভিন্ন হয়ে ক্রমে ক্রমে বৃহৎ আকার লাভ করেছে এ কল্পনা অসংগত হবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে বিহারীলাল প্রমুখ সমকালীন কবির প্রভাব কিছু কিছু পড়েছে; তাঁর ধর্মানুভূতির উপর রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সাধনার প্রভাব আরও ব্যাপক, আরও গভীর।

অঙ্কুর

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মাদর্শের অভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন নি। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "ব্রাহ্ম পরিবারে যদিও আমার জন্ম তবু ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে আমার মন কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হয় নি। তার একটা কারণ, অতি শিশুকালেই আমার মধ্যে কবিপ্রকৃতি অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল—আমি আমার কল্পনা নিয়েই সর্বদা ভোর হয়ে ছিলুম—ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কে কি বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায় নি।

তারপরে আমার বয়স যখন ১৩।১৪ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্ফুট রকমে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম।" [প্রবাসী ১৩'৪ পৌষ]

অবশ্য, বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ সক্রিয় হয়েছিল এ কথা বলা চলে না। তাঁর ধর্মচিন্তায় ভারতীয় একাধিক ধর্মাদর্শের ছায়াপাত হয়েছে, কিন্তু তিনি কোনোটিকেই সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেন নি। ব্রাহ্মধর্ম আর বৈষ্ণবধর্ম ছাড়াও সুফী সাধনা, বৌদ্ধধর্ম, সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সাধনারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায়। বস্তুত তাঁর কবি-প্রকৃতি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মাদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে নি। তিনি যার মধ্যে অনুকূল ভাবনার সন্ধান পেয়েছেন তাকেই গ্রহণ করেছেন আবার যেখানেই তিনি প্রতিকূল আদর্শ দেখেছেন সেখানেই তাঁর চিত্ত বিরূপ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন অর্থাৎ উনবিংশ

শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার সর্বত্র একটা ভাববিপ্লব দেখা দিয়েছিল—ধর্মচিন্তা সেই বিপ্লবের একটা প্রধান অংশ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংযোগ ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের উন্মাদনাকে প্রবল করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির ধর্মাদর্শ উন্মেষিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন ধর্মচিন্তাকে মুখ্য স্থান না দিলেও তাঁর ত্রয়ী মহাকাব্যে কৃষ্ণচরিত্রের রূপায়ণ স্মরণীয়। একদিকে যেমন রামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য বিবেকানন্দ আর আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী নিজেদের ধর্মাদর্শ প্রচার করছিলেন, অপর দিকে কৃষ্ণানন্দ স্বামী বা শশধর তর্কচূড়ামণির মতো ধর্মব্যাখ্যাতাও এ যুগে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাও এই সময়েই হয়েছিল।

কিন্তু একই কালে ধর্মের এই নূতন ধারাগুলি প্রবাহিত হলেও কোনোটি অপরটির সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি। সম্ভবত পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য-বোধ দেখা দিয়েছিল যার জন্য এ যুগের ধর্মসাধকদের মধ্যে অনেকটা তাঁদের অজ্ঞাতসারেই একটা স্বকেন্দ্রিকতা এসে গিয়েছিল; একটা সর্বজনীন ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার কোনো প্রয়োজন যে আছে এ বোধটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের কিশোর হৃদয় এই বিচ্ছিন্ন ধারাগুলির কোনোটির প্রতি তেমন আগ্রহ বা অনুরাগ পোষণ করে নি। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছেলেবেলা থেকে জাগে নি—প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি একবার সোৎসাহে এর সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের বন্ধন তাঁকে বেশিদিন বাঁধতে পারে নি।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হলেও বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর পিতৃদেবের প্রভাব পড়েছে। বারো বছর বয়সে উপনয়ন হবার পর থেকেই তিনি কিছুকাল পিতার সাহচর্য লাভ করেছিলেন। এই সময় গায়ত্রীমন্ত্র তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট

করেছিল। গায়ত্রীমন্ত্র তাঁর বালকচিত্তে যে একটা উদাসভাব এনে দিয়েছিল তার বর্ণনা 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। গায়ত্রীমন্ত্র তাঁর চিত্তকে কীভাবে স্পর্শ করেছিল তার আভাস দিয়ে 'The Religion of Man' গ্রন্থে তিনি বলেছেন "This (গায়ত্রীমন্ত্র) produced a sense of serene exaltation in me, the daily meditation upon the infinite being which unites in one stream of creation my ·mind and the outer world." [পৃষ্ঠা ৯৩]

গায়ত্রীমন্ত্র দেবেন্দ্রনাথের মতোই রবীন্দ্রনাথের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরিণত বয়সে গায়ত্রীমন্ত্রের তাৎপর্য তাঁর কাব্যের মধ্যেও (যেমন 'সাবিত্রী' কবিতা) অনুস্যূত হয়েছে। গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা তিনি অনেক জায়গায় করেছেন, তার একটি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—

"আমাদের প্রতিদিনকার মন্ত্রের আরম্ভ ভূর্ভুবঃ স্বঃ,—সমগ্র বিশ্বের উপলব্ধি। নিজেকে বিরাট সৃষ্টির মধ্যে দেখা, সমস্তের সঙ্গে নিজের একান্ত যোগ অনুভব করা, এই হল ব্যাহৃতি।

তৎসাবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

সৃষ্টিকর্তার বরণীয় তেজ ধ্যান করি—বাইরের দিকে সৃষ্টিকর্তার প্রকাশ ভূর্ভুব স্বর্লোকে সেই সৃষ্টি অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে চৈতন্যে। অসীম চৈতন্য সেই চৈতন্য প্রেরণ করেছেন আমার অন্তরে। বাইরে এই বিশ্বসৃষ্টি এবং অন্তরে এই চৈতন্যধারা দুইকে একত্র মিলিয়ে ধ্যান করি তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ। সৃষ্টিকর্তার এই বরণীয় তেজ নিজের চৈতন্যে উপলব্ধি দ্বারা অসীম চৈতন্যের মুক্তি অনুভব করি। আমাদের থাকতে হবে সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সেই আলোতে—যে আলো নিত্য বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের মনকে বিশুদ্ধ করে দেয়। যে-বৃহতের মধ্যে ক্ষতি নেই, মরণ নেই, সেই অসীমে আমাদের আত্মাকে বিস্তীর্ণ

করে দেওয়ার সাধনা—বৃহতের সাধনা—আমাদের প্রতিদিনকার নয়।" [মাঘোৎসব প্রবাসী ১৩৪৩ বৈশাখ]

গায়ত্রীমন্ত্রকে শ্রদ্ধা করলেও বা 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে যে-সব মন্ত্র সংকলিত হয়েছে তার প্রতি আকর্ষণ থাকলেও মন্ত্রজপে যে কোনো সুনির্দিষ্ট ফল পাওয়া যেতে পারে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। বরং জড় অভ্যাসের বশে মন্ত্র জপ করার প্রতি তিনি বিরাগই পোষণ করেছেন। 'অচলায়তন' নাটকে মন্ত্রজপের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র কটাক্ষ আছে।

মন্ত্রের আবৃত্তি জড় অভ্যাসে পরিণত হলে মন্ত্রের সার্থকতা থাকে না, সম্ভবত এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই রবীন্দ্রনাথ 'শান্তি-নিকেতন' বা অন্যান্য গ্রন্থে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। এখানে এক একটি মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আছে তা আলোচনামাত্র নয়, তাকে মন্ত্রের ধ্যান বলা অসংগত হবে না। তাঁর শিল্পী প্রাণ মন্ত্রকে নানা ভাবে আস্বাদ করবার জন্য উৎসুক হয়েছিল।

উপনয়নের পরই রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা বড়ো ঘটনা ঘটেছে—সেটি পিতার সঙ্গে হিমালয়যাত্রা আর এই যাত্রার আগে বোলপুরে (তখনও শান্তিনিকেতন নাম হয় নি) কিছুকাল অবস্থিতি। শান্তি-নিকেতনের উদার প্রকৃতির মধ্যে তাঁর চিত্ত মুক্তি পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে স্বীকার করেছেন, "শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। ...সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম ..এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতি-ভাত নীলাভ শাল ও তালশ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপর এই আকাশে, এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃ-দেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তাঁর গভীর গাম্ভীর্য।" [আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা', প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন]

বালক রবীন্দ্রনাথ পিতার পরিচয় হিমালয়ে আরও বেশি করে পেয়েছিলেন। মহর্ষির ভক্তমূর্তি তাঁর চিত্রপটে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের শান্ত ভক্তিরস এখান থেকেই সর্বপ্রথম তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। হিমালয়ের নির্জন পরিবেশও তাঁর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতার সাহচর্য আর প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণ তাঁর চিত্তকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল; দেবেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের রীতিমত অধ্যয়নের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের ইতিহাসে এই হিমালয়প্রবাসের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল—পদাবলীর সাহিত্য অংশই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। 'অস্ফুট রকমে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে' প্রবেশলাভ করলেও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব এ সময়ে তাঁকে নাড়া দেয় নি, কৈশোরের রচনা 'ভানুসিংহের পদাবলী' মুখ্যত তার সাহিত্যকর্মের জন্য উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলগত ভক্তিরস এই কাব্যে অনুপস্থিত। তবে বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের কিছুটা এই সময় রবীন্দ্রনাথের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল—পরবর্তী কালে তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন—এগুলির মধ্যেও সাহিত্যকর্ম যেটুকু আছে সেই টুকুই উল্লেখযোগ্য, ভক্তিরস এমন কি যথার্থ কাব্যরসও এখানে পাওয়া যায় না। এই সময়ের গানগুলি সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "কবি ও সংগীতকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনা করিলেন বটে, তবে সেগুলিকে তাঁহার অনুভূতিমূলক কাব্য-ঐশ্বর্য বলা যায় কিনা তাহাই বিচার্য। জীবনের অনেক কাজ আমরা সামাজিক প্রয়োজন, লৌকিক চাহিদা অথবা ব্যক্তিগত অনুরোধাদির জন্য কর্তব্য হিসাবে পালন করি। রবীন্দ্রনাথের বিশ বৎসর বয়সে রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি ভগবদভক্তি-প্রণোদিত আধ্যাত্মিক সংগীত

বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।" [রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃষ্ঠা ৮৪] —বস্তুত তিনি গীতিকার, ব্রাহ্মপরিবারে তাঁর জন্ম আর তাঁর পিতা ব্রাহ্মসমাজের পুরোধা—এই জন্যই তিনি ব্রহ্মসংগীত রচনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে এ যুগে ধর্মসাধনার জন্য তাঁর অন্তরের আগ্রহ ছিল না। তাঁর অন্তরে এ সময় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য দেখা যায়; তা একদিকে যেমন কাব্যের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করতে উৎসুক হয়েছিল, তেমনি গদ্যের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' বা 'মহাস্বপ্ন' কবিতায় তাঁর যে সৃষ্টিবোধ ব্যক্ত হয়েছে তা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের অনুগত নয়—এর মধ্যে হিন্দুধর্মের পৌরাণিক একটি কল্পনার কবিজনোচিত রূপায়ন আছে। তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে ঈশ্বর বা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে যে বোধের পরিচয় পাই, ব্রাহ্মসমাজের মত বা বিশ্বাসের সঙ্গে তা ঠিক মেলে না। তাঁর শিল্পবোধ ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষাকৃত সীমায়িত ঈশ্বরজ্ঞানকে চরম বলে মেনে নিতে পারে নি। তবে তিনি প্রকাশ্যে কোথাও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি। সামাজিক জীবনে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজকেই সমর্থন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার পরিচয় নিতে গেলে তাঁর কেবল ধর্ম-সম্পর্কে মতামতগুলি অবলম্বন করলেই চলবে না; তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তাঁর অন্তরের যে ভাবগুলি ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলির সাক্ষ্যের মূল্য কম নয়, বরং সেগুলির মধ্যেই তাঁর অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায় বলে নির্দেশ করা অসংগত হবে না। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন আর শিল্পজীবনের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না; বরং দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পিতামহীর মৃত্যুকালে শ্মশানে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সেটিকেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্বোধক বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা অনুরূপ

একটা ঘটনা দেখতে পাই। একদিন সকালে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফ্রী স্কুলের বাগানের একটি গাছের দিকে তাকিয়েছিলেন। "তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটায় বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।···আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত, সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকেই যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় আগে তাহা লক্ষ্য করি নাই—এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিতে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক

করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটি গোরু আর একটি গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।" [রবীন্দ্র-বচনাবলী ১৭, পৃষ্ঠা ৩৯৬-৩৯৮]

এই সৌন্দর্য আর আনন্দের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের মূলে বর্তমান। সৌন্দর্যে মাধুর্যে মণ্ডিত এই জগৎসংসার উপেক্ষার বিষয় নয়—এর প্রতি তীব্র অনুরাগ তাঁর কবিচিত্তে মূলীভূত। 'প্রভাত-সংগীত' আর 'ছবি ও গানে'র অনেক কবিতাতেই জগতের সৌন্দর্য-মাধুর্য উপভোগ করবার আকুল আবেগ দেখা যায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে তাঁর এই জীবনবোধ সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে সন্ন্যাসী প্রকৃতিকে দমন করে তার উপরে আপনার জ্ঞানকে স্থাপন করেছিল। জগতের সৌন্দর্যকে, সংসারের হাসিকান্নাকে সে মায়া বলে, মোহ বলে উপেক্ষা করেছে। বহুকাল তপস্যার পর আপনাকে সে প্রকৃতিজয়ী বলে মনে করেছে—'বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে।' সংসারের সমুখে দাঁড়িয়ে সংসারকে তার 'সৃষ্টির পঞ্জর' আর 'ছেলেখেলা' বলে মনে হয়েছে। কিন্তু একটি বালিকার স্নেহ তার অন্তরের নিরুদ্ধ প্রকৃতিকে জাগ্রত করে তুলেছে। যে জগৎকে সে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করেছিল, সেই জগতের অপরূপ মধুরিমা তাকে আকর্ষণ করেছে। সেই আকর্ষণ আর জ্ঞানমাত্রলিপ্সু সন্ন্যাসীর বিরাগের দ্বন্দ্বটি এই নাটকের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। জগতের সৌন্দর্য একবার তাকে মুগ্ধ করেছে—সে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছে

সহসা পড়িল চোখে একী মায়া ঘোর,
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি!

কিংবা

আহা এ কী সুমধুর ! এ কী শান্তি সুধা।
কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে।
মনে সাধ যায় ঐ তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।

আবার পরমুহূর্তেই তার মনে হয়েছে যে জগতের মোহবন্ধ থেকে তার মুক্তি ঘটেছে, তার নিরাসক্ত চিত্ত বিশ্বের সৌন্দর্যে বা সংসারের মাধুর্যে মুগ্ধ হবার নয়।—

বন্দী করে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে বসে গা তোদের মায়াগানগুলি—
অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।

কিন্তু এই বৈরাগ্যের এই নিরাসক্তির সুর অতিক্রম করে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সন্ন্যাসীর জ্ঞানমোক্ষবোধ বিদীর্ণ করে চিরন্তন মানবের হৃদয়বৃত্তিই সবলে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নাটকের পরিশেষে যে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে তার কারণ পুরোপুরি নাট্যিক নয়; নাটকীয় সংঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ন্যাসীর হাহাকারের চিত্রাঙ্কন করে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের উপরে হৃদয়বৃত্তির স্থান নির্দেশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে যেখানে বুদ্ধির বিরুদ্ধে হৃদয়ে বিদ্রোহ, 'বিসর্জন' নাটকে সেখানে প্রথার বিরুদ্ধে, আচারের বিরুদ্ধে প্রেমের বিদ্রোহ ব্যক্ত হয়েছে। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বহুকাল থেকে দেবীর পূজায় বলি হয়ে আসছে। এই প্রথা অন্ধ ভক্তির আবরণে পরিপুষ্ট হয়ে ভক্তদের মনে এমন বদ্ধমূল হয়েছে যে, এই বলিদানে প্রাণের ধ্বংস যে সাধিত হচ্ছে তার দিকে কারও দৃষ্টি পড়ে নি। এমন কি রাজার মহিষী যে গুণবতী দেবীর কাছ থেকে একটি শিশু এতটুকু প্রাণের কণিকা প্রার্থনা করেছেন, তিনিই বলেছেন

করিনু মানৎ, মা যদি সন্তান দেন,
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ মহিষ,
তিন শত ছাগ।

এই আচার বা বিধির মধ্যে যে নৃশংসতা আছে রাজা গোবিন্দমাণিক্য তা উপলব্ধি করেছেন—'প্রকৃতির প্রতিশোধে' একটি বালিকা যেমন জ্ঞানমুগ্ধ সন্ন্যাসীর হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিল, এখানেও একটি বালিকা তাঁর সত্যদৃষ্টি উন্মোচন করেছে। প্রথা যতই বৃদ্ধ হোক না কেন তার স্থান মানুষের মনুষ্যত্ব বা প্রেমের উপরে নয়—রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিটি গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই নাটকে মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে

অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা।

গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে জীববলি নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু বিধি বা আচার বহুকাল অভ্যাসের বশে মানুষের মনে যখন সংস্কার হয়ে ওঠে তখন তা দূর করা সহজ হয় না। সেজন্য প্রজারা থেকে আরম্ভ করে রানী গুণবতী পর্যন্ত সকলেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন, মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি রাজার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্যত হয়েছেন। নাটকটির মধ্যে রঘুপতির পরাজয় যে-ভাবে ধীরে ধীরে স্তরপর্যায় অতিক্রম করে অবশেষে জয়সিংহের মৃত্যুতে চরমে এসে পৌঁছেছে, তা মুখ্যত নাট্যলীলার অন্তর্গত হলেও এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের আদর্শের ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে। প্রতিমাবিসর্জন বাহ্যত একটা বড়ো ঘটনা হলেও রবীন্দ্রনাথ এটাকে শেষ কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, "তার চেয়েও বড়ো কথা হলো জয়সিংহের আত্মত্যাগ—কারণ তখনই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারেন যে প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়।"

আমাদের সমাজের মধ্যেও এমন অনেক প্রথা আছে, মূলে যে

তাৎপর্যই থাকুক না কেন এখন সেগুলো অর্থহীন বা অনেক জায়গায় নির্মম হয়ে উঠেছে। সেগুলো সংস্কার করবার চেষ্টা করলেই আমাদের অন্ধ বিশ্বাস হয় বিদ্রোহ ঘোষণা করে আর না হয় সংশয় পোষণ করে বলে

পাপের কি এত পরমায়ু হবে?
কত শত বর্ষ ধ'রে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতা-চরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এলো,
সে কি পাপ হতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাটকে হৃদয়ের দিক থেকে এই সব সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্যত হয়েছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের মধ্যেও মানুষের হৃদয়কেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এই যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত মুখ্যত হৃদয়কে অবলম্বন করেই প্রকাশিত হয়েছে।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি। (প্রভাত উৎসব)

এই উক্তি তাঁর একটা ভাবাবেশ (mood) মাত্র নয়, এই তাঁর এ যুগের কাব্যের মূল মর্ম, তাঁর কবিচিত্তের সুদৃঢ় বিশ্বাস। জগৎকে তিনি জীবন থেকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। রূপের যে হিল্লোল, হৃদয়ের যে বন্যা আমাদের জীবনকে পরিপ্লাবিত করে দেয় তাকে অস্বীকার করার অর্থ জীবনকেই অস্বীকার করা—তা মানুষের স্বধর্মের প্রতিকূল। কাব্যের মধ্যে যে জিনিসটি একটা অনুভূতি হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তী কালে সেইটিই পরিপুষ্ট চিন্তায় পরিণতি লাভ করেছে।

রবীন্দ্রচিত্তে অনুভূতির প্রাধান্য বা প্রাবল্য থাকলেও পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অভাব ছিল না। দার্শনিক বা চিন্তাবীরদের মতো চিন্তা তিনি করেন নি, অথচ তাঁর রচনা যুক্তিহীন ভাবালুতায় দুর্বল নয়। তাঁর মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম বোধশক্তি ছিল—যেটাকে বোধি বলা অসংগত

হবে না—যা তাঁর সমস্ত কল্পনার মধ্যে মনস্বিতা সঞ্চার করেছে। অন্ধ আবেগের বদলে যুক্তিসিদ্ধ কল্পনাকে তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। বস্তুত এই যুক্তিনিষ্ঠাই আধুনিকতার একটা বড় লক্ষণ।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে লেখা 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি' প্রবন্ধে ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা পরবর্তী কালে বিভিন্ন কবির হাতে নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি প্রকারান্তরে আদি ব্রাহ্মসমাজের অদ্বৈতবাদের সমর্থন করে খ্রীষ্টীয় ঈশ্বর কল্পনার সমালোচনা করে বলেছেন, "ঈশ্বরের এরূপ অপূর্ণ হীন আদর্শ মানুষের নীতিগত প্রকৃতিকে যে অবনত করিয়া রাখে।" [উদ্ধৃতি রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃষ্ঠা ১১২] পূর্ণতার আদর্শের প্রতি আগ্রহ তিনি কিছু পরিমাণে পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক (১৮৮৪) তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একবার মসীবিরোধ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধে লোকহিতার্থে কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করে যে মিথ্যা বলা হয় তা সত্যই, এই ধরণের কথা বলেন। 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতের বিরোধিতা করে বলেন, "আমরা যদি জাতিকে কোনো উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবল উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে, তাহা নহে, তাহার বংশে সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। বৃহত্ত্ব একটি উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।" [উদ্ধৃতি রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃষ্ঠা ১৫৮]—বঙ্কিমচন্দ্র 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধে বলেন যে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে ঐ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়ে বলেন, "আমি যে লেখা লিখিয়াছি বিশেষরূপে ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।"—বস্তুত 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ

যে কথা বলেন তা তাঁর নিজস্ব আদর্শ; কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদ গ্রহণ না করলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের অংশ-বিশেষের সমালোচনা করতে অগ্রসর হতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাই হোক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রই যে একটি পত্র লিখে 'এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন' করে ফেলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে সে কথা স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। এই সময় অল্প কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। 'রাজা রামমোহন রায়' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে তিনি ব্রাহ্মধর্মের মত আর বিশ্বাসকে সমর্থন করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমার এ ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না, চাহিও না; ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট ঋণী।" [উদ্ধৃতি রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃষ্ঠা ১৫৯] 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি ব্রাহ্মধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখালেও নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে ধর্মসাধনার চেয়ে ধর্মসংস্কারের আগ্রহই বেশি দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। সংস্কার ছেদনের নামে প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক থাকাকালে ধর্ম সম্পর্কে তিনি যে সব প্রবন্ধ রচনা করেন তাতে তাঁর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই রচনাগুলোর প্রতি তাঁর মমতাও ছিল না। 'একটি পুরাতন কথা' 'সমালোচনা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল—ঐ গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধের যে অংশ 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে সংকলিত, সেটুকুতে ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন করে তিনি যা বলেছিলেন তা বাদ পড়েছে। সামাজিক দায়িত্ব পালন করবার জন্য তিনি যা করেছিলেন

তাতে তাঁর অন্তর যে পরিতৃপ্ত হয় নি তা তিনি বহুকাল পরে 'The Religion of Man' গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন—"Urged by my sense of duty I strenuously persuaded myself to think that my new mental attitude was in harmony with that of the members of the association, although I constantly stumbled upon obstacles and felt constraints that hurt me to the quick.

At last I came to discover that in my conduct I was not strictly loyal to my religion, but only to the religious institution The latter represented an artificial average, with its standard of truth to its static minimum, jealous of any vital growth that exceeded its limits I have my conviction that in religion, and also in arts, that which is common to a group is not important. Indeed, very often it is a contagion of mutual imitation. After a long struggle with the feeling that I was using a mask to hide the living face of truth I gave up my connection with the church." [পৃ ১০৯-১১০]

প্রচলিত বাঁধা আদর্শের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রসঙ্গে তথাকথিত নব্য হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করলে চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তি এঁর দিকে আকৃষ্ট হন। এই দলের মতবাদে যুক্তির চেয়ে কুযুক্তি, বিচারের চেয়ে অন্ধ বিশ্বাসই বেশি পরিমাণে ছিল। এঁদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মধর্মের 'ঈশ্বরের নিরাকার চৈতন্যময় স্বরূপের' বিরুদ্ধে প্রচার করলে আর

সেই সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মকে নানা দিক দিয়ে আক্রমণ করলে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তাঁর গদ্যরচনায় বা কবিতায় এই নূতন মতবাদের যুক্তিহীনতার প্রতি বিরাগ বা বিদ্রূপ ব্যক্ত হয়েছে। এই নূতন হিন্দুয়ানি বা আর্যামিকে ব্যঙ্গ করে লেখা 'দামু ও চামু', 'আর্য ও অনার্য', 'ধর্মপ্রচার', 'একান্নবর্তী পরিবার,' 'সূক্ষ্মবিচার,' 'গুরুবাক্য', নূতন অবতার' প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পাবে। এ যুগের নব্য হিন্দুদের মতামতে যেমন উগ্রতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গেও তেমনই কঠোরতা বা নির্মমতার অভাব ছিল না।

এই জাতীয় রচনার মধ্যে তাঁর সদর্থক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সাময়িক প্রতিক্রিয়ায় যে সমস্ত গদ্য-পদ্য রচিত হয়েছে তার পরিমাণ কম না হলেও তার মধ্যে রবীন্দ্রচিত্তের যথার্থ প্রতিফলন হয় নি। এগুলো বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত ব্যঙ্গমাত্র। বরং এই সমস্ত রচনার সমকালে তিনি অন্য যে-সব কবিতা রচনা করেন সেগুলির মধ্যে সাময়িক ঘটনায় অনাসক্ত বিশুদ্ধ কবিচিত্তেরই প্রকাশ দেখা যায়।

বস্তুত এ যুগে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ মুখ্যত তাঁর সৃজনধর্মী রচনাবলীর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। যে অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ আর রসানুভূতি তাঁর পরিণত বয়সের ধর্মবোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তার সূত্রপাত এই যুগেই হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও অতিমাত্রায় পরিশীলিত সৌন্দর্যবোধ ছিল—রবীন্দ্রনাথ সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন এ কথা বলা অসংগত হবে না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার থেকে রবীন্দ্রনাথ যা পেয়েছিলেন তার পরিমাণ কম নয়। প্রাচীন সংস্কারের বহু আবর্জনা তাঁর পরিবার থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। তাঁর পিতা বা জ্যেষ্ঠেরা গতানুগতিকতার অনেক বাধা অপসারিত করেছিলেন। পরবর্তী কালে *'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে শৈশব-পরিবেশের পরিচয় প্রসঙ্গে* তিনি

বলেছেন, "যে সংসারে চোখ মেলেছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত। ...আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল। ..এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,—মহাদেশ থেকে দূর-বিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুর স্বাতন্ত্র্যের মতো।" [পৃষ্ঠা ৮৫-৬]

এই স্বাতন্ত্র্যই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে তথা ঠাকুরবাড়ির জীবনচর্যায় একটা মুক্তির সুর এনে দিয়েছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে এই মুক্তির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে দীর্ঘ জীবনে তাঁর অনেক সংস্কার অপনীত হয়েছে। এমন অনুমান করা অসংগত হবে না যে তাঁর জীবনে সত্যবোধ যতই গভীর হয়েছে, বাহ্য সংস্কারের বন্ধন ততই শিথিল হয়েছে।

বিকাশ

'সাধনা' পত্রিকা অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সবলে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় তাঁর সৃষ্টিসম্ভার এমন সুপ্রচুর হয়ে ওঠে যে অনেকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির এই যুগটাকে 'সাধনার যুগ' বলে নির্দেশ করেন। একটা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিজীবনের একটা যুগ প্রকাশিত, এই কল্পনার মধ্যে একটু আতিশয্য আছে বটে কিন্তু 'সাধনা' পত্রিকায় বা এই পত্রিকা প্রকাশের সমকালে অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ ধর্ম দেখা যায়—সেটি পরিণতির ধর্ম। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীকল্পনা যৌবনসমাগমে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কাব্যকলার দিক দিয়েও যেমন, তেমনই ভাবের দিক দিয়েও সমৃদ্ধির পরিচয় এই সময়কার প্রায় সর্বশ্রেণীর রচনাতেই পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম এই যুগেই রবীন্দ্রচিত্তের যথার্থ পরিচয় সাহিত্যের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' আর 'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে প্রচলিত সন্ন্যাসের আদর্শ আর প্রথাকে অতিক্রম করে হৃদয়কে প্রাধান্য দেবার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ করেছেন। আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্বে সৌন্দর্যবোধ আর হৃদয়াবেগের মূলে গভীর ঐক্যসম্বন্ধ নির্দেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতেও এই দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর শিল্পী সত্তা যে সৌন্দর্যের উপাসক তা অসঙ্গ তত্ত্বমাত্র নয়, তা প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে, তার জীবনের সঙ্গে জড়িত। তাঁর ধর্মবোধও হৃদয়বৃত্তি আর সৌন্দর্যবোধকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীজীবনের পরিচয় লাভ করেন। "বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিতে লাগিল, ইহাতে দেখিতে দেখিতে কবির রচনা ব্যক্তিত্বের বন্ধন ছাড়াইয়া বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। অনুভূতিগুলির

প্রকাশ ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া উঠিল।” [রবীন্দ্রনাথ—অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৩৭]—যে হৃদয়বৃত্তি ব্যক্তিগত শিল্প-সাধনার অবলম্বনমাত্র ছিল তা বৃহত্তর পরিসরের মধ্যে অনুভূত হওয়ায় তাঁর জীবনবোধ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁর ধর্মবোধও এ যুগে সবলতর। ধর্মকে জীবন থেকে পৃথক করে তাকে স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসের প্রতিবাদ ‘বৈষ্ণব কবিতা’য় ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে প্রেমলীলার বর্ণনা দেখা যায় তা তত্ত্বত অপ্রাকৃত হলেও তার মধ্যে মানুষের জীবনরস যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। ‘দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা’ এই ছত্রটির মধ্যে যে প্রগাঢ় মানবপ্রীতি ব্যক্ত হয়েছে তা ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’—‘বিসর্জনে’র অনুভূতিরই পরিণতি।

‘পঞ্চভূতে’র নিবন্ধগুলির মধ্যে মানুষের জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণের পরিচয় নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে—মানুষের হৃদয়ধর্মকে তিনি এখানে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। ‘মনুষ্য’ প্রবন্ধে কথাপ্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা উদ্ধারযোগ্য—“যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। সমগ্র বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ বিসর্জন দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন

করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।”

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাটি ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার অনুগামী নয়। বেদের কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াকলাপের দিকে যে ঝোঁক আছে তা-ই হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ধর্মের নামে আচার বা বাহ্য অনুষ্ঠানকে সমর্থন করতে পারেন নি। আচার্য শঙ্করও বেদবিহিত কর্মের নিন্দা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর মতবাদ রবীন্দ্রনাথের আদর্শের উৎস নয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শের মূলে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব আছে—তবে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম থেকেই তাঁর এই বোধটি পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্মে বেদের যাগযজ্ঞ বা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আছে তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তা ছাড়াও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে মৈত্রীর আদর্শ আছে তা তাঁর কবিচিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। ধর্ম’ গ্রন্থের ‘উৎসবের দিন’ প্রবন্ধে তিনি সশ্রদ্ধভাবে বুদ্ধদেবের এই বাণীটি স্মরণ করেছেন

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং॥
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয়ং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

“মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্র্যভাবে

অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ঃ১৩, [পৃষ্ঠা ৩৯৬

'মালিনী' নাটকের মধ্যে দেখি যে রাজকন্যা মালিনী বেদবিহিত ধর্মকে উপেক্ষা করে এই নবীন ধর্মের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেছেন। তাঁর মাতা তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন,

লহ ব্রতক্রিয়াকর্ম
ভক্তিভরে। শিবপূজা করো দিনযামী।

রাজকন্যার আচরণে ব্রাহ্মণসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন—তাঁরা রাজকন্যার নির্বাসন চেয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস যে 'যজ্ঞযাগে সিদ্ধি হবে'—'শুদ্ধাচারে যোগাসনে' সোৎসাহে মন্ত্রপাঠ করলেই ব্রহ্মতেজ উপার্জন সম্ভবপর।—রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের 'সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন' রূপের মধ্যে দুটি ধর্মের সংঘাতের বিস্তৃত চিত্র অঙ্কন করেন নি; মালিনীর অপরিমাণ মৈত্রীভাবনার পরিচয়েই নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। মালিনী যে-ধর্ম অনুসরণ করেছে তা সে নিজ মুখে বিবৃত করে নি—ক্ষেমংকরের কাছে সুপ্রিয়ের উক্তিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।—

যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেম স্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
বুঝিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুনঃ; দাতারূপে
করে দান, দীন রূপে করে তা গ্রহণ,—
শিষ্য রূপে করে ভক্তি, গুরু রূপে করে
আশীর্বাদ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব ত্যাগ। ধর্ম বিশ্ব লোকালয়ে
ফেলিতেছে চিত্তজাল। নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে।

পরবর্তী কালে 'কথা ও কাহিনী'র একাধিক কবিতায়, 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি নাটকে আর অনেক প্রবন্ধের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের মৈত্রীর আদর্শটি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'কাহিনী' নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি, অহংকার, লোকায়ত আদর্শের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। মহাভারতের ধর্মচারিণী গান্ধারী রাজ্যধন-লুব্ধ পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন,

ধর্ম নহে সম্পদের সেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

ন্যায়ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে গান্ধারী রাজার কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন করেছেন। ধর্মকে বলিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তাকে কোনো অংশে ক্ষুদ্র বা খর্ব করে দেখা চলে না। এই ন্যায়ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কাতেই কর্ণ কুন্তীর আহ্বান সত্ত্বেও কৌরবপক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে সম্মত হন নি।

'সতী' কবিতাতে সত্যধর্মকে লোকায়ত ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে হৃদয়ধর্মেরই জয়গান করেছেন। হিন্দুকন্যা হয়েও মুসলমানের আদর্শ পত্নী হওয়া যায় এবং তাতে সতীত্বধর্ম বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না—বরং তাকে পূর্বে বাগ্‌দত্ত হিন্দুর মৃতদেহের সঙ্গে দাহ করার মধ্যে ধর্মদ্রোহ রয়েছে, এই ভাবটি এই কবিতায় প্রকাশিত। 'পতিতা' কবিতায় সকল আবিলতা, সকল গ্লানি অতিক্রম করে চিত্তের প্রকাশ যে সম্ভব তা দেখানো হয়েছে। 'নরকবাস' কবিতা অহংকার-প্রমত্তের ধর্মদ্রোহের দৃষ্টান্ত। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বাল্মীকি যে আদর্শ পুরুষের কল্পনা করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বের আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

'নৈবেদ্যে'র মধ্যে ধর্ম তথা জীবনাদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের

ধারণা কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যের মূল সুরটির আভাস 'কাহিনী' নাট্যকাব্যে থাকলেও এখানেই সেটি সর্বপ্রথম নিটোল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর পাশাপাশি আর একটি যে সুর প্রবাহিত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আর কল্পনায় চিরপুরাতন। 'চৈতালি' কাব্যের 'দেবতার বিদায়' কবিতায় তিনি মানবসংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে রুদ্ধ দেবালয়ে সাধনার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। 'পুণ্যের হিসাব' বা 'বৈরাগ্য' কবিতায় সন্ন্যাসের উপরে গৃহধর্মকে স্থান দিয়ে তিনি বলেছেন, 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।' এখানে তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

জীবনের প্রতি বিমুখ হয়ে, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকে উপেক্ষা করে নিছক সন্ন্যাসের সাধনাকে তিনি আদর্শ বলে স্বীকার করতে পারেন নি।—

যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

এই যে বিশ্বের সব-কিছু আনন্দের মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দের কল্পনা, ব্রহ্মে চিত্ত-সমর্পণ করেও দৃশ্য-গন্ধ-গানের মাধুর্যের প্রতি অনুরাগ— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে এই আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুত 'নৈবেদ্য' কাব্যের বহু কবিতায় যে আদর্শ প্রতিভাত হয়েছে তা দেবেন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবেন্দ্রনাথের মতোই 'নৈবেদ্যে'র রবীন্দ্রনাথও 'আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কে ব্রহ্মের প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন;

এই কাব্যে তাঁর পিতৃ-প্রভাবিত ধ্যান ও ধারণাই মুখ্যত ব্যক্ত হয়েছে। এই কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে দেবেন্দ্রনাথের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলা অসংগত হবে না—এই কাব্যটি তিনি যে 'পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে' উৎসর্গ করেছিলেন তা সংগতই হয়েছে।

'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের সচেতন ধর্মবোধের ফল। যে পরিবেশের মধ্যে তাঁর জীবন পরিবর্ধিত হয়েছে তার পূর্ণ প্রভাব এই কাব্যটির মধ্যে দেখা যায়। অনেকগুলি কবিতায় ব্রাহ্মধর্মের আদর্শই স্পষ্টভাবে কাব্যের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এই কবিতাগুলির মূলে অনুভূতির প্রেরণা যতখানি আছে তার চেয়ে বেশি আছে চিত্তের কর্ষণা। এই কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "নৈবেদ্য পাঠ করিয়া সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ একটি তুরীয় অবস্থায় উঠিয়া এই 'আধ্যাত্মিক' কবিতাগুলি রচিয়াছিলেন। কিন্তু যথার্থত তাহা নহে ; সংসারের অসংখ্য কর্তব্য-পালনের মধ্যে, প্রতিদিনের সংগ্রাম ও সংশয়, অভাব ও অভিযোগ, বিষয়সম্ভোগ ও বৈষয়িকতার মধ্যে ক্ষুব্ধ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ও শান্ত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণের যে প্রয়োজন বোধ হয়, তাহাই হইতেছে 'নৈবেদ্য' রচনার প্রেরণা।···কবিতা বা সংগীত যখনই কোনো সংস্কারগত ধর্ম বা পরম্পরাগত নীতিবোধের প্রয়োজনসাধন করিতে চেষ্টা করে, তখনই কাব্যশ্রী কুণ্ঠিতা হন। নৈবেদ্যের অনেকগুলি কবিতা আদি ব্রাহ্মসমাজীয় ধর্মমতবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন। মনের যে নৈর্ব্যক্তিক ও নৈর্ধর্ম্য অবস্থা হইলে সৌন্দর্যলক্ষ্মী 'রসাতল' হইতে কবিমানসে আত্মপ্রকাশ করেন, এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে সে-রসের সন্ধান মেলে না। ঐ সব কবিতার ভাষা মার্জিত, ভাব মহত্ত্বব্যঞ্জক, রচনা ওজোগুণসম্পন্ন। কিন্তু যথার্থ দুঃখের তাপে বা অনুভূতির বেদনায় উহারা কবিচিত্তে মূর্তি-গ্রহণ করে নাই ; তজ্জন্য বাস্তবতার ঐকান্তিকতা ইহাদের

মধ্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রেরণায় কতকগুলি অনুভাব ছন্দোময় ওজস্বিতায় নৈবেদ্যকবিতারূপে মুক্তিলাভ করিয়াছে; জ্ঞান, মনীষা ও অনুভাবের ত্রিবেণী-সংযোগে এই কবিতারাজির জন্ম।” [রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃষ্ঠা ১ -১১]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তরল ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রকাশকে তিনি গ্রহণ করেন নি—তাঁর মধ্যে এমন একটা সুদৃঢ় সংযম ছিল যা তাঁকে সব রকমের অতিরেকের প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথও ‘জ্ঞানহারা উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা’ চান নি। তাঁর প্রার্থনা—

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসার ভবনদ্বারে। যে ভক্তি অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে।

এই শান্তরসের সাধনা আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ছিল—দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এই আদর্শই মূর্তিলাভ করেছিল। বাংলাদেশ ভক্তিপ্রধান। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের অনুসরণে ভক্তির নামে যে ভাবোন্মত্ততা দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। জীবনের প্রতি একটা সুদৃঢ় নিষ্ঠা তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলিষ্ঠভাবে জীবনকে গ্রহণ করবার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি বলেছেন,

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন॥

এই সময়ে তাঁর অন্তরে ঈশ্বরে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠেছে—সেটি তাঁর দেশাত্মবোধ। এই

দেশাত্মবোধই তাঁকে প্রাচীন ভারতের রূপকল্পনায় প্রণোদিত করেছে। কালিদাসের কাব্য-নাটক বা অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য আর উপনিষদের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতের যেটুকু পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে প্রাচীন ভারত তাঁর চোখে অপরিসীম শ্রদ্ধা আর গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর এ যুগের অজস্র রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রতি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমান ভারতের তুলনায়, বিশেষ করে পাশ্চাত্য ভোগময় জীবনের তুলনায় প্রাচীন ভারতের ত্যাগময় জীবনের শ্রেষ্ঠতার কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের কল্পনা তাঁকে এত মুগ্ধ করেছে যে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' বা 'শকুন্তলা' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ত্যাগের দিকেই, তপস্যার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রাচীন ভারতের উপনিষদের ঋষিদের আধ্যাত্মিক সাধনার বাণী, জীবনে সত্যসাধনার ক্ষেত্রে তাঁদের জীবন্ত উপদেশ (এই দুটিই 'ব্রাহ্ম-ধর্ম'গ্রন্থের মধ্য দিয়ে পাওয়া), কালিদাস-প্রমুখ কবির রচনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের জীবনের সঙ্গে অস্পষ্ট অথচ কল্পনাপরিপুষ্ট পরিচয়, নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের ফলে ভারতের সমাজের দিকে নূতনভাবে দৃষ্টিপাত—বিভিন্ন উপাদানে এই সময় রবীন্দ্রনাথের চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সময়ে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার গ্রহণ করায় তাঁর মননবৃত্তিও এই সময় অনুশীলিত হয়েছে। সুতরাং স্বদেশের দিকে চিত্তকে প্রসারিত করে দেবার অনুকূল অবলম্বনও তাঁর কল্পনা পেয়েছিল।

স্বদেশের দিকে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত কী ভাবে সবলে আকৃষ্ট হয়েছিল তার বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, "প্রবল অনুভূতি ও কল্পনার যোগে সমস্ত জিনিসকে দেখিবার দরুন যখনই কোনো খণ্ডতার মধ্যে কবি গিয়া পড়েন—হোক তাহা বাহ্য সৌন্দর্য, হোক মানবপ্রেম, হোক স্বদেশানুরাগ—তখন সেই

খণ্ডতাকে খণ্ডতা বলিয়া জানিবার কোনো উপায় তাঁহার থাকে না। জীবনের অন্যান্য সকল দিককে আচ্ছন্ন করিয়া সে বড় হইয়া এবং একান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এইটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াও অমনিই শুরু হয়। খণ্ডতাকে বিদীর্ণ করিয়া আবার তাঁহার সর্বানুভূতি আপনাকে সমগ্রের মধ্যে নির্বাধ ও মুক্ত করিতে সক্ষম হয়।

স্বাদেশিক জীবনেও এই কাণ্ডটিই ঘটিয়াছে। কেবল যে প্রাচীন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ তাঁহার নিজের জীবনের পূর্ণতার পক্ষে প্রয়োজন ছিল বলিয়া সেই আদর্শটুকুই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। স্বদেশ তাঁহার কল্পনানেত্রে তাহার অতীত ও বর্তমান, তাহার হীনতা ও বিকৃতি, তাহার আশা ও নৈরাশ্য সমস্ত লইয়াই অখণ্ডভাবে দেখা দিয়াছিল। দেশের সেই অখণ্ড ভাবরূপ তাঁহার সমস্ত চিত্তকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করাতেই হিন্দুসমাজকেও সেই ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার একটা উদ্যোগ তাঁহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল।" [রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫]

এই নবজাগ্রত আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি ভারতবর্ষের সভ্যতাকে ইউরোপের সভ্যতার উধ্বে স্থাপন করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে ইউরোপের সভ্যতা কর্মসংক্ষুব্ধ আর 'ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে।' ইউরোপের সভ্যতায় কর্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনাই প্রবল আর ভারতবর্ষের আদর্শ 'সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা।' 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'নববর্ষ' প্রবন্ধে তিনি আশা করেছেন যে বর্তমানে ভারতবাসীরা যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ, তবু সনাতন ভারতবর্ষের ব্রহ্মমন্ত্র একদিন তার অন্তরে প্রবেশ করবেই।

'ধর্ম' গ্রন্থের 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রার আদর্শটি বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে

তিনি একটি উপদেশবাণী উদ্ধার করেছেন, 'সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।' তিনি বলতে চেয়েছেন যে বাইরের উত্তেজনার মধ্যে সুখকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুখ অন্তরেই আছে, তা 'সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান।' প্রবৃত্তির বেগকে সংযত করে সন্তোষময় জীবন যাপন করাই তাঁর কাছে আদর্শ বলে প্রতিভাত হয়েছে—কারণ সেইরকম চিত্তেই শান্তং শিবমদ্বৈতম-এর উপলব্ধি সম্ভবপর।

ইউরোপে ধর্মের আদর্শ জীবনের সঙ্গে জড়িত নয়। এমন কি ওদেশে ধর্ম আর নীতির মধ্যেও একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। ধর্ম আর নীতির বিচ্ছেদকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে পারেন নি। ভারতবর্ষের ধর্মাদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স্ হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম আমোদ হইতে, কাব্যকলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৩৭৯]

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপবীতধারীরাই যে আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময় আচার্যের বেদীতে বসবে এটা অন্যায় বলে দেবেন্দ্রনাথের কাছে অনুযোগ করেছিলেন। আর এখন আবার তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মের জয়গান করছেন

এটা আশ্চর্যজনক বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। এ কথা সত্য যে প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগের জন্যই তাঁর অন্তরে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি আকর্ষণ জেগেছিল। কিন্তু প্রচলিত জাতিভেদকে তিনি শ্রেয় বলে গ্রহণ করেন নি। বর্ণাশ্রম ধর্ম একটা আদর্শায়িত মূর্তিতে তাঁর অন্তরে স্থান লাভ করেছিল। 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে চতুরাশ্রমের বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি আর ক্রমশ অবনতির ধারাটি অবলম্বন করে ভারতবর্ষের চতুরাশ্রম পরিকল্পিত হয়েছে। "প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৪৩১] এই চতুরাশ্রমের কল্পনাটি আর একটু বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, "প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তর রূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্ত সংগতিপূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়।" [পৃষ্ঠা ৪৪০]

'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে তিনি ব্রাহ্মণের আদর্শকে সম্মান দিয়েছেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছেন যে বর্তমানে ব্রাহ্মণ তার সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত নয়, কারণ তার আদর্শ থেকে সে ভ্রষ্ট হয়েছে। 'যে ব্রাহ্মণ পয়সার পরিবর্তে আপনার ব্রাহ্মণ্যকে ধিক্কৃত' করে সে কখনও সমাজের পুরোভাগে থেকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। কেবল ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যও 'জড়ত্বপ্রাপ্ত সমাজের শৈথিল্যবশতই' আপন অধিকার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণ যে নিজের চেষ্টায় পূর্বের গৌরব ফিরে পাবে তা সম্ভপর নয়। সমগ্র সমাজ যদি না উন্নত হয় তাহলে ব্রাহ্মণের উন্নতি

সম্ভবপর নয়। এখানেও তিনি ব্রাহ্মণের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের বদলে তার আদর্শগত শ্রেষ্ঠত্বের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

এই সময় ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনার চেয়ে সমাজগত ধর্মসাধনার দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ইউরোপের জনমণ্ডলীর শক্তির উৎস রাষ্ট্র আর ভারতবর্ষের জনগণের অবলম্বন সমাজ। ইউরোপে রাষ্ট্রের যে আদর্শ পরিকল্পিত হয়েছে তার মধ্যে ধর্মের কোনো স্থান নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজ ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তার সমাজনীতিগুলি ধর্মনীতিরই অঙ্গ। এ দেশে সমাজদ্রোহ ধর্মদ্রোহেরই নামান্তর; সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই এ দেশে ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সমগ্র সমাজকে ধর্মের আদর্শে গড়ে তোলা সম্ভব কি না এ প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই প্রশ্ন তুলে তার উত্তরে বলেছেন, "যখন ঘরে আলো জ্বলে, তখন কি পিলসুজ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্যন্ত প্রদীপের সমস্তটাই জ্বলে? জীবন-যাপন সম্বন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে যে-দেশের যে-কোনো আদর্শই থাক না কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিতার ডগাটামাত্র জ্বলাকেই সমস্ত দীপের জ্বলা বলে। তেমনি দেশের এক অংশ মাত্র যে ভাবকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন, সমস্ত দেশেরই তাহা লাভ। বস্তুত সেই অংশটুকুমাত্রকে পূর্ণতা দিবার জন্য সমস্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে হয়, সমস্ত সমাজকে অনুকূল হইতে হয়—ডালের আগায় ফল ধরাইতে গাছের শিকড় ও গুঁড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে আমাদের দেশের মান্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ সত্য ও সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি, একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার

করিবেই। একদিন ভারতবর্ষে ঋষিরা যখন ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন, তখন সমস্ত আর্যসমাজের মধ্যেই—রাজকার্যে যুদ্ধে বাণিজ্যে সাহিত্যে শিল্পে ধর্মার্চনায়—সর্বত্রই সেই ব্রহ্মের সুর বাজিয়াছিল। কর্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিয়াছিল—ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজস্থিতি মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতেছিল, 'যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।'" [রবীন্দ্রবচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৪৩৮-৪৭]

এ যুগে যেমন ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার চেয়ে সমাজগত ধর্মসাধনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে, তেমনই স্ব-গত উপলব্ধির চেয়ে ধর্মকে জীবনাচরণের মধ্যে সত্য করে তোলবার একটা বাসনা তাঁর অন্তরে দেখা গেছে। বস্তুত ধর্মকে যদি অধ্যাত্ম-অনুভূতির সোপান বলে গ্রহণ করা যায়, তাহলে মন্ময় আর গূঢ় হবেই। কিন্তু ধর্মকে যদি জনমুক্তির পন্থা, সমগ্র সমাজের জাগৃতির অবলম্বন বলে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে ধর্মের সেই রূপটাই ব্যক্ত হয় যা চর্যার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পাবে: যে ধর্ম মানবসমাজকে ধারণ করতে পারে তার দৃঢ় ভিত্তিভূমি দরকার। মহর্ষির ধর্মাদর্শের অনেকখানিই জীবনে পালন করবার উপযোগী ছিল। রবীন্দ্রনাথও ধর্মের জীবনগ্রাহ্য রূপটি ব্যক্ত করতে উৎসুক হয়েছেন।

এইজন্যই তিনি এমন একটি আদর্শের সন্ধান করতে অগ্রসর হয়েছেন, যা জীবনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করবে অথচ জীবনকে শক্তির আতিশয্যে মদগর্বে স্ফীত করে তুলবে না, যা জীবনকে উপেক্ষা করে সন্ন্যাসকে গ্রহণ করবে না অথচ সংসারের জালে জড়িয়ে পড়বে না। প্রাচীন যুগের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শের কথা এ প্রসঙ্গে তাঁর মনে জেগেছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রহ্ম আর গৃহ দুইয়ের কোনটিকেই উপেক্ষা করেন নি। তিনি 'যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'—যে কাজ করবেন, ব্রহ্মেই তা সমর্পণ করবেন। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন, ইহাতে একই কালে কর্ম ও বিরাম,

চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।" [রবীন্দ্রবচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৩৫১]

জীবনে একদিকে যেমন সুকঠিন সত্যসাধনাকে বরণ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনিই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগসূত্রটি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। 'নৈবেদ্য' কাব্যের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার ভারতবর্ষে নির্ভীক চিত্ত, মুক্ত জ্ঞান, উদারতা, অবিরাম কর্মধারা, আচারাতিশায়ী বিবেকবুদ্ধি, পৌরুষ প্রার্থনা করেছেন—সেই সঙ্গে ভগবানকে 'সর্ব-কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা'র পদে সমাসীন রেখেছেন। একদিকে সমুচ্চ আদর্শ যেমন প্রয়োজন, অন্যদিকে ঈশ্বরের উপর নির্ভরও তেমনিই অনুপেক্ষণীয়। একদিকে কর্ম, আর একদিকে প্রেম; 'তস্য প্রিয়কার্যসাধনম্' আর সেই সঙ্গে 'তস্মিন্ প্রীতিঃ।' 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে তিনি এই ভাবটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "সংসারেই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব, তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে,—যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের—সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মূর্তিলাভ করিতেছে—এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানা দুঃখের এক আনন্দ-অবসান,—ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম ও মুক্তি একই হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝংকার একটি আনন্দ-সংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৩৫২]

এই আনন্দের উপলব্ধিটি রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ তথা উপনিষদ থেকে পেয়েছেন। উপনিষদে আনন্দ থেকেই এই বিশ্ব উদ্ভূত এই কল্পনা করা হয়েছে। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'—'সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।'—"মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রাণধারণ করিতেছি।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৩৫৭]

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আনন্দ আর প্রেম যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। যা-কিছু আমরা সুন্দর দেখি, যা-কিছু আমাদের অন্তরে আনন্দরূপে প্রতিভাত হয়, তাই ঈশ্বরের প্রেম। 'নৈবেদ্যে'র একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

> একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
> হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
> প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে, নানা গন্ধে গীতে,
> মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।

তবে এই প্রেমের বোধটি, আনন্দের বোধটি, সৌন্দর্যের বোধটি তাঁর ধর্মচেতনায় অদ্বিতীয় রসরূপে এখনও সুপ্রতিষ্ঠ হয় নি। পরবর্তী যুগে যে সুনিবিড় অনুভূতিতে তাঁর রচনাবলী পরিপ্লাবিত হয়েছে, এখানে তার আভাসমাত্র আছে। এখানে তিনি ভগবানকে জীবনসাধনা থেকে বাদ দেন নি, বিশ্বের সকল কর্মকে তাঁর কর্ম বলে গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছেন ; কিন্তু ধ্যানরসের চেয়ে কর্মরস তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছে—গভীর অন্তর্মুখীন অনুভবের চেয়ে বিশ্বের মঙ্গলসাধনে আত্মোৎসর্গ করবার প্রেরণাই তাঁর জীবনকে বিচিত্র

কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিয়ে গেছে, তাঁর কাব্যের মধ্যেও সেই সুর ব্যক্ত হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেছেন,

তোমার পতাকা যারে দাও তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি।

বাস্তবিক পক্ষে এই সময় তাঁর জীবনে একটা অভূতপূর্ব কর্মোন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করে তিনি সমাজের সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সারা বাংলাদেশে যে স্বদেশচিন্তা জেগেছিল তা তাঁর চিত্তকে বিশেষভাবে উদ্বেজিত করেছিল। এই যুগের স্বদেশী আন্দোলনের চিন্তানায়কদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই দেশের সমস্যাগুলো বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করেছিলেন—তাঁর অজস্র গান সে সময় দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। এই বিপুল কর্মযজ্ঞের আকর্ষণে তাঁর আত্মমুখীন চিত্ত বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এইজন্যও ধর্মকে বিশেষভাবে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার আদর্শ তিনি বারবার প্রচার করেছেন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ধর্মকে কোনো একটা বাহ্য আকারের মধ্যে আবদ্ধ রাখবার জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না—বরং ধর্মের নামে আচারের বা অনুষ্ঠানের পৌত্তলিকতার বিরোধিতা তিনি বরাবরই করে এসেছেন। তিনি একদিকে জীবনের মধ্যে কর্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছেন, অপরদিকে ব্রহ্মের অভিমুখে চিত্তকে প্রসারিত করে দেবার কথা বলেছেন। ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে জীবনের মধ্যে বিচরণই তাঁর আদর্শ। 'নৈবেদ্যে'র একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীকৃত জড়ের জঞ্জাল,

মৃত আবর্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্মধামে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে যে প্রার্থনামন্ত্রটি সংকলন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই মন্ত্রটিকে মানুষের যথার্থ প্রার্থনা বলেছেন। 'ধর্মে'র অন্তর্গত 'প্রার্থনা' প্রবন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন,— শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন, একটিমাত্র প্রার্থনা আছে তাহা এই—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্ব-প্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩]

এই প্রার্থনামন্ত্রটিতেই জীবনের মধ্যে চরম সত্যের প্রকাশের কল্পনাটিই প্রাধান্যলাভ করেছে। কেবলমাত্র অতি সুগভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতি নয়—জীবনের মধ্যে সত্যের প্রকাশ, জ্যোতির প্রকাশ, অমৃতের প্রকাশই প্রার্থনা করা হয়েছে। আবিঃস্বরূপের যে আবির্ভাব প্রার্থনা করা হয়েছে তা ধ্যানস্থ মুহূর্তমাত্রের চকিত দর্শনের জন্য নয়, জীবনের সর্বস্তরে তার প্রকাশ চাই। রুদ্রের যে মুখখানির দিকে মন্ত্রকারের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়েছে, তা বিশেষ করে

প্রেমময় নয়, তা মঙ্গলময়, তা মানুষকে নিত্য রক্ষা করবে। এই মন্ত্রের তাৎপর্যে অন্তর্মুখীনতার চেয়ে বহির্মুখীনতাই যেন বেশি করে ব্যক্ত হয়েছে—নিবিড় অধ্যাত্মরসের চেয়ে জীবনকে সত্যের আলোকে, ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত করাই অভিপ্রেত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কেন যে জীবনের মধ্যে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দিয়েছেন তার কারণগুলি পুনরুল্লেখ করা অসংগত হবে না। প্রথমত তাঁর অন্তরে মানুষের জীবনের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল, স্নেহপ্রেমমণ্ডিত মানবজীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ চিরদিনই ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত যৌবনমধ্যাহ্নে কর্মের প্রতি তাঁব আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। তিনি নিজে আপনার জীবনকে বিচিত্র কর্মের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং কর্মমুখর জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্থাপন করার কল্পনা সহজেই তাঁর অন্তরে জেগেছে। তৃতীয়ত ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব, বিশেষ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁকে জীবনবিমুখ হতে দেয় নি। দেবেন্দ্রনাথ কর্মভার আর ব্রহ্মোপাসনা কোনোটিকেই উপেক্ষা করেন নি। রবীন্দ্রনাথও জীবনকে একদিকে ন্যায়ের কঠোর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাখতে, অপরদিকে জীবনে শান্ত ভক্তিরস সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম আর ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনা এই যুগের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অন্য বিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাদানমাত্র রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না, ছাত্রদের জীবনকে সর্বাঙ্গ-পরিপুষ্ট করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন 'ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে' তিনি ছাত্রদের জীবনকে গড়ে তুলতে উৎসুক হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শের কল্পনা তখন তাঁর অন্তরকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। তিনি সেই আদর্শে ছাত্রদের আবিষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে আকৃতির দিক দিয়েও যেমন তেমনই প্রকৃতির দিক দিয়েও শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তনের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু জীবনকে সমগ্রভাবে বিকশিত করে তোলবার যে

আদর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন তা অক্ষুণ্ণ ছিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথকে অনেকে যে জীবনশিল্পী বলেন তা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। শিল্পসাধনাকে, সৌন্দর্যসাধনাকে তিনি কেবল সাহিত্যের মধ্যে বা শিল্পের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন নি—জীবনের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন। তরুণ-বয়সী বালক বালিকাদের জীবন যাতে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির পাষাণভার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হতে পারে তাঁর জন্য তাঁর উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। ভারতের প্রাচীন তপোবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শান্তিনিকেতন স্থাপন করেছিলেন এই উক্তি অংশত সত্য বটে, কিন্তু তাঁর কবিচিত্ত কোনো একটা স্থিতিশীল আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেনি। তাঁর গতিশীল কল্পনায় শান্তিনিকেতনের রূপ বার-বার পরিবর্তিত হয়েছে, কেবল মানব-মানবিকার জীবন যাতে সতেজে স্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট হতে পারে সেই দিকে তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন। জীবনের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ তাঁকে জীবনের প্রতি বিমুখ হতে দেয় নি। এইজন্যই মানসী-সোনার তরী-চিত্রার যুগে তাঁর চিত্ত একদিকে যেমন অনন্ত সৌন্দর্যের সাগরপারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে চেয়েছে অপর দিকে কল্পনার স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে এই মৃত্তিকার পৃথিবীর জীবনরস নিবিড়ভাবে অনুভব উপভোগ করবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হয়েছে। তাঁর সমগ্র কাব্যের মধ্যে লিরিক ভাবাবেগের প্রাচুর্যের সীমা নেই বটে, কিন্তু তিনি যে কবিকল্পনা পরিত্যাগ করে ধর্মকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এটাকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর নিছক আনুগত্য বলে কল্পনা করলে ভুল করা হবে। তাঁর সমগ্র চেতনার মধ্যেই জীবনের প্রতি যে গভীর অনুরাগ ছিল তাই আপনার পরিতৃপ্তির জন্য এক-দিকে যেমন মানবলোকের স্নেহ-প্রীতি অবলম্বন করে রচিত অসংখ্য কবিতা ও ছোটো গল্পের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, অপরদিকে তেমনই ধর্মকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে।

ফুল

জীবনদেবতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন, "কবিজীবনে যিনি সৌন্দর্যের প্রেরণা জাগাইয়া ইঙ্গিতের আসন গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানসসুন্দরী। কবিজীবনের মধ্য দিয়া যিনি নিজেকেই পূর্ণতাব দিকে লইয়া যাইতেছেন তিনি জীবনদেবতা। আর যিনি কবিব মননের ও করণের মধ্য দিয়া নিজেকেই প্রকাশ করিতেছেন তিনি অন্তর্যামী।" [বাঙ্গলা সাহিত্যেব ইতিহাস ৩ (প্রথম সংস্কবণ), পৃষ্ঠা ১০৭]

কবি বহির্বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্যের বিচিত্র লীলা দেখেছেন—কিন্তু সেটিকে কেবলমাত্র বাইরের জিনিস বলে মনে করেন নি, সেই সৌন্দর্যের মূলে তিনি আপনারই চিত্তের একটি শক্তি কল্পনা করেছেন। দর্শনশাস্ত্রে আমাদের সব অনুভূতির মূলে আমাদের ব্যক্তিসত্তার সক্রিয়তা নির্দেশ করা হয়েছে। বাইবে আমরা যেটা দেখি সেটা আমাদের অন্তরে বিশেষ মূর্তি পরিগ্রহ করে। প্রখ্যাত দার্শনিক এখ্‌হার্ট বলেন, "Every time that the powers of the soul come into contact with created things, they receive and create images and likenesses from the created things and absorb them. In this way arises the soul's knowledge of created things. Created things can not come nearer to the soul than this, and the soul can only approach created things by the voluntary reception of images. And it is through the presence of the image that the soul approaches the created world; for the image is a Thing, which the soul creates with her own powers" [পাদটীকায় উদ্ধৃতি An Introduction to Mysticism—Evelyn Underhill, পৃষ্ঠা ৬-৭]

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় অনুরূপ তত্ত্বৈষণা শেষ-জীবনে দেখা যায়। যেমন,

আমরাই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,—
সুন্দর হল সে।

কিন্তু তাঁর যৌবনের সৌন্দর্যকল্পনায় দেখি যে তিনি বাহির বিশ্ব আর অন্তরকে একই সৌন্দর্যতরঙ্গে হিল্লোলিত বলে অনুভব করেছেন। বিশ্বের মধ্যে যে সৌন্দর্য বিকশিত তা যে বিশেষ করে ব্যক্তি-সত্তারই সৃষ্টি এই ভাবটি তাঁর মনে জাগে নি। তাঁর মনে হয়েছে যে এই সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্যলক্ষ্মী আপনার আসন পেতে দিয়েছেন—তিনি জগতের মধ্যে বিচিত্ররূপিণী, কিন্তু অন্তরের মধ্যে অদ্বিতীয়া। জগতের মধ্যে তাঁর বহু বিচিত্র বিলাসের সীমা নেই অথচ অন্তরের মধ্যে তিনি একা একাকী—

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে
চারিদিকে চির যামিনী।

কবি যেমন বিশ্বের সব সৌন্দর্যের 'অচপল দামিনী'র মতো একটি প্রতিমূর্তি আপনার অন্তরের মধ্যে কল্পনা করেছেন, তেমনই তাঁর সমগ্র কর্মপ্রয়াসের মূলে, তাঁর জীবনের সমস্ত সাধ ও সাধনার মূলে একটি শক্তি তাঁর মধ্যে রয়েছে বলে অনুভব করেছেন। কিন্তু এই শক্তিকেই জীবনের সব কিছুর জন্য দায়ী করে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে জড় করণমাত্র বলে কল্পনা করেন নি। জীবনদেবতা আর ব্যক্তিসত্তা

এই দুইটিই তাঁর কাছে জীবনের সমস্ত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের জন্য দায়ী বলে প্রতিভাত হয়েছে। পরিণত বয়সে তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, "ভক্ত যখন বলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি, তখন হৃষীকেশের থেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন সুতরাং তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা হৃষীকেশের'পরেই। চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্ম-সত্তা আমি অনুভব করছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে-দুঃখে আমার ভালোয়-মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র আর এক আমি যন্ত্রী হতে পারে কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে, যন্ত্রের স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ, পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা। তাই বলা হয়েছে

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে।

পরমদেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তার ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই; নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে নি এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কি না এই আশঙ্কামূলক প্রশ্ন,

চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত চিত্রার জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলননাট্যের উল্লেখ রয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিসিক্ত নয়।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ৪, চিত্রার ভূমিকা]

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা জীবনেরই দেবতা—তিনি ভগবান বা বিশ্বদেবতা নন। যে সর্বানুভূ ব্রহ্ম আপনাকে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রকাশ করে দিয়েছেন এই জীবনদেবতা কবির জীবনের মধ্যে মূর্ত তাঁরই একটি বিশেষ রূপ নন—বরং তাঁকে জীবেরই আত্মা বলা যেতে পারে। জীব আর জীবাত্মার মধ্যে দ্বৈতলীলার কল্পনা রবীন্দ্র-নাথের এই যুগের অনেক কবিতায় ফুটে উঠেছে, জীব তার আত্ম-স্বরূপকে জানে না অথচ তারই জন্য সে জীবন থেকে বিভিন্ন উপচার সংগ্রহ করছে—আপনার জীবনের সুখদুঃখের মালাটি তারই কণ্ঠে সমর্পণ করছে। তার জীবনের সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে, সমস্ত ভাবনা-কামনার মধ্যে বহির্জগতের যেমন একটা প্রভাব আছে, তেমনই অন্তর্জগতের একটা সুগভীর প্রেরণাও রয়েছে। এই দুটি তত্ত্বত ভিন্ন হলেও কার্যত এক, কারণ জীবনদেবতাই জীবের জীবনকে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার মধ্য থেকে বিচিত্র সুর ধ্বনিত করে তুলছেন। বহির্জগতে লীলার যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তার মধ্যে জীবনদেবতারই বিশেষ অভিপ্রায় সাধিত হচ্ছে। জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র করে দেখে রবীন্দ্রনাথের জীবসত্তা জীবাত্মার সঙ্গে আপনার নিবিড় সম্পর্কটির মাধুর্য উপভোগের জন্য উৎসুক হয়েছে—এইজন্যই তাঁর জীবসত্তা জীবাত্মাকে দয়িতরূপে কল্পনা করে প্রশ্ন করেছে

লেগেছে কি ভালো, হে জীবন নাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত,
আমার নর্ম, আমার কর্ম
তোমার বিজনবাসে।

যে ব্যক্তিসত্তাকে গ্রহণ করে জীবনদেবতা লীলা করছেন, সে

তাঁকে তৃপ্ত করতে পারছে কি না এই প্রশ্ন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে জেগেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-কল্পনার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি জীবনদেবতাকে কেবল বর্তমান জীবনের নেতৃ বলেন নি। এই জীবনদেবতা যেন যুগে যুগে অজস্র জন্মে তাঁর জীবনকে বিকশিত করে আসছেন।—"তিনি যে কেবল আমার এই ইহ জীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্য দান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদি কাল হইতে বিচিত্র-বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত কবিয়াছেন; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ৪, পৃষ্ঠা ৫৫৫]

জন্মান্তর সম্পর্কে যে ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বা বৌদ্ধ জাতকে বা অন্যত্র জন্মান্তর সম্পর্কে যে সব কাহিনী পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ তাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর যে জীবনটা গড়ে উঠেছে অতীতের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে।তা যে জড়িত এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, "এই পৃথিবীর সঙ্গে কত দিনের চেনাশোনা। বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।··· তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যোদয় পান করেছিলুম, অন্ধ জীবনের গূঢ় পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুট্‌ত, নব পল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘন নীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করস্পর্শের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে মুখোমুখি

করে বসলেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে।" [উদ্ধৃতি কাব্যপরিক্রমা, পৃষ্ঠা ৪]

রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতির মধ্যে বিশ্বজীবনের বোধটি বর্তমান—তিনি আপনার চেতনাকে যেন সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাঁর বর্তমান জীবনটি বিশ্বের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুদূর অতীতের উদ্ভিদ-জীবনও তাঁর এই বর্তমান জীবনের মধ্যে নিহিত আছে। মানুষের চেতনার মূলে বংশাগতির কল্পনা করা হয়, কিন্তু সেই বংশাগতির পূর্বসীমা কোথায়? আমাদের যে সত্তা জীবনের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তার মধ্যে সমকালের প্রভাব আছে, কিন্তু তার আন্তর ধর্মটি অতীত যুগ থেকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হয়ে আসছে। আমাদের এই মানবদেহের মধ্যে জীবকোষের যে ধর্মটি প্রকাশমান তার মূলে অসংখ্য কোটি বৎসরের ইতিহাস বর্তমান। আমাদের চেতনার মধ্যেও তেমনই যুগযুগান্তরের প্রভাব রয়েছে। অতীত যুগের গাছের সঙ্গে এখনকার আমির পার্থক্য অভিব্যক্তির দিক থেকে সুপ্রচুর, কিন্তু দুইয়ের মধ্যেই এমন একটা চিরজীবন রয়েছে যার মধ্যে জীবরূপ আর জীবাত্মার দ্বৈতলীলা সমভাবে বর্তমান। কবির জীবনদেবতা যুগ যুগ ধরে তাঁর জীবনকে বিকশিত করে তুলে আসছেন। অবশ্য কবি তাঁর অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির উপাদানমাত্র নন—তাঁর ব্যক্তিত্ব আর জীবনদেবতার মধ্যে একটা লীলা আবহমান কাল ধরে রয়েছে। কবি যে বলেছেন,

> হে চিরপুরানো, চিরকাল মোরে,
> গড়িছ নূতন করিয়া!
> চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
> রবে চিরদিন ধরিয়া!

এর মধ্যে 'গড়া'র কথাটা চরম নয়, জীবনদেবতা যে 'সাথে' ছিলেন এইটাই কবির অনুভূতিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনদেবতাকে

তিনি প্রভুর পদে বসান নি—দয়িতের মূর্তিতে তিনি তাকে কল্পনা করেছেন। যুগ যুগ ধরে জীবনলীলার মধ্যে তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্কের ধারাটি জীবনের বহু বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে সেটি প্রেমের।

জীবনদেবতা-কল্পনার মধ্যে আধ্যাত্মিক রসপ্রেরণা নেই—কবির আত্মমুখীন কাব্যপ্রেরণা আর সৌন্দর্যপ্রেরণাই এর মূলে বর্তমান। তবে কবির দৃষ্টি এই যে একবার অন্তরের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, আত্মার মধ্যে একটা নিগূঢ় ধর্ম আবিষ্কার বা উপলব্ধি করতে এই যে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, এর ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়েছে। 'খেয়া' কাব্যে দেখতে পাই যে তাঁর অন্তরের মধ্যে একটা সুগভীর পিপাসা জাগ্রত হয়েছে। বাইরের বিচিত্র রূপে ক্লান্ত হয়ে তাঁর কবিচিত্ত যেন একটা গভীর গহন শান্তির আশ্রয় অন্বেষণ করছে—বাইরের কর্মসংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সমগ্র হৃদয় একটা শান্তিলোকের জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। তাঁর যে গূঢ় আত্মমুখীন দৃষ্টি জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করে দিয়েছিল তাই তাঁকে অধ্যাত্মরসের সন্ধান দিয়েছে। চিত্রার মধ্যে যেখানে আত্ম-অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির মধ্যে সেখানে অধ্যাত্ম-অনুভূতিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রকৃতি যে কী রকম সে সম্পর্কে সচেতন না হলে বিভ্রান্তির আশঙ্কা আছে। আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বা সাধক ছিলেন না। বৈষ্ণব পদকর্তারা যেমন একদিকে পদরচনা করতেন অন্যদিকে তেমনই জীবনের মধ্যে বৈষ্ণব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা করতেন—রবীন্দ্রনাথ কোনো নীতির বশবর্তী হয়ে সেভাবে জীবন-সাধনা করতে অগ্রসর হন নি। পাশ্চাত্য মরমিয়াদের মতো তাঁর জীবন অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন হয় নি। তাঁর প্রকৃতিটি ছিল কবির। কিন্তু তাই বলে যে আধ্যাত্মিকতাকে নিছক উপাদান রূপে গ্রহণ

করে শিল্পকলার সাধনার জন্যই খেয়ার কবিতা বা গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির গানগুলি রচনা করেছিলেন এ রকম সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে। তাঁর সমগ্র চেতনার মধ্যে একটা নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভূতি ছিল—সেই অনুভূতিটিই তাঁর শিল্পিচেতনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে—যা একটি বোধমাত্র ছিল তা কাব্যের মধ্যে গানের মধ্যে রঙে রসে সমৃদ্ধ হয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই বোধ আর শিল্পচেতনার মধ্যে একটা পার্থক্য কল্পনা কবা হল বটে কিন্তু মানবসত্তায় এই দুটি অখণ্ডরূপে বর্তমান। তাঁর জীবনদবতাবোধটি যেমন কাব্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতিও তেমনই কাব্যের রূপরসের সঙ্গে বিজড়িত হয়েই আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ কবি—সেই সঙ্গে গীতরচয়িতা, সুরকার। গানের ধর্মই এই যে তার মধ্যে রূপ আর রস একটা অনিবচনীয় ভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে ওঠে—তা আমাদের বহিরিন্দ্রিয় শ্রুতিকে আনন্দ দেয় বটে কিন্তু আমাদের অন্তরের গভীরতর প্রদেশে তার তরঙ্গ গিয়ে পৌঁছয়। গানের যে আনন্দ তা মুখ্যত অনুভূতিগ্রাহ্য—সংগীতস্রষ্টার মধ্যে অনুভূতির শক্তিটিই সব চেয়ে প্রখর। রবীন্দ্রনাথের চেতনার মধ্যে অনুভূতিশীলতার ধর্মটিই প্রাধান্যলাভ করেছিল—বিশুদ্ধ মননের পরিবর্তে একটা সূক্ষ্ম গভীর অনুভবশক্তিই তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে বর্তমান। এই অনুভূতিতে যা ধরা পড়ে তাকে জ্ঞান বলা যায় না—তাকে বোধ বলা যেতে পারে এই মাত্র। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা একটা সচেতন তত্ত্বজ্ঞান নয়, তা তাঁর অনুভূতিশীল বহুমিশ্রবোধের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে; তাঁর সমগ্র জীবনবোধ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাঁর কাব্যজীবনের মূলে যে রসপ্রেরয়িত্রী শক্তি বর্তমান, এই অধ্যাত্ম-চেতনা তার মধ্যে অদ্বয়রূপে না হলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হয়ে আছে। এই চেতনাটি তাঁর সাধনালব্ধ ফল নয়—এটি

তাঁর আন্তরসত্তায় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মতোই একটা বিমিশ্র সংস্কারে পরিণতিলাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতিগুচ্ছের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কী কী উপাদানে তাঁর অধ্যাত্মচেতনা গড়ে উঠেছে তা স্মরণ করা যেতে পারে। সর্বপ্রথমেই ব্রাহ্মধর্মের কথা উল্লেখ করতে হয়। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে উপনিষদের আনন্দবাদটি সাদরে গৃহীত হয়েছিল। 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে,' 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান' প্রভৃতি গানে এই আনন্দের সুরটি ব্যক্ত হয়েছে। উপনিষদের আনন্দ একটি তত্ত্ব—ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে সেটিকে একটি সত্যরূপে উপলব্ধি করবার প্রয়াস আছে—রবীন্দ্রনাথও এই বিশ্বকে আনন্দে পরিপ্লাবিত বলে কল্পনা করেছেন। ব্রাহ্মধর্মে ঈশ্বরকে প্রেমময় বলা হয়েছে—এই প্রেম বৈষ্ণবের অহেতুক জ্ঞানশূন্য ভক্তি নয়, এই প্রেম দিব্য করুণার নামান্তর না হলেও রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ ঐই প্রেম আর আনন্দকে একত্র গ্রথিত করে গেয়েছেন।

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে-ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

বিশ্বের মধ্যে ভগবানের প্রেম আর আনন্দের কল্পনাটি ঔপনিষদিক চিন্তা নয়। এমন কি ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেও ঠিক এর যথাতথ প্রতিরূপটি দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে উপাস্য আর বিশ্বকে স্বতন্ত্র করে দেখা হয়েছে—কিন্তু রবীন্দ্রকল্পনায় যেন ভেদ আর অভেদের, দ্বৈত আর অদ্বৈতের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ব্রহ্ম থেকে যে আনন্দ ক্ষরিত হচ্ছে, সেই আনন্দই এই বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত। কিন্তু ব্রহ্ম যে এই বিশ্বের উপাদান ঠিক এই

ধরণের কল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেন নি—নিম্বার্কাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে মেলালে অমিলই চোখে পড়ে। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ কি না তাও তাঁর রচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। অবশ্য তিনি 'স একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' এই মন্ত্রে বিশ্বাসী। এই বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি যে বিস্ফুরিত হচ্ছে এই বোধটি তাঁর রচনার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। গায়ত্রীমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—বিশ্বময় ধীশক্তির প্রেরণা তাঁর একটি বিশেষ কল্পনা।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রকল্পনার সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ তাঁকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলতে চেয়েছেন—কিন্তু ঠিক এইভাবে তাঁর মতবাদকে চিহ্নিত করা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে একটা সাদৃশ্যের ভাব থাকলেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা পরবর্তীকালের বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার পার্থক্য অনুভূত হবে।

অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাবাদর্শের সঙ্গে তাঁর কল্পনার কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। তত্ত্বত রাধা কৃষ্ণের শক্তি—এই শক্তির সঙ্গে তাঁর চিরন্তন লীলা। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণব রাধা আর কৃষ্ণের প্রেমকে ভক্ত আর ভগবানের প্রেমে রূপান্তারত করবার দিকে এগিয়ে গেছেন। রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রেমে উন্মাদ, কৃষ্ণও তেমনই রাধার সঙ্গে মিলনের জন্য একান্ত উৎসুক; ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য সাধনা করছেন, ভগবানও তেমনি ভক্তের প্রেমে আপনাকে বিলিয়ে দিতে চান। বৈষ্ণব আদর্শে ভক্তকে ভগবানের চেয়ে বড়ো বলে দেখানো সম্ভবপর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও একদিকে ভগবানের দিকে আপনার হৃদয়কে মেলে দেবার কথা বলেছেন, অন্যদিকে ভগবানও যে ভক্তকে প্রেমে বরণ করবার জন্য যুগ যুগ ধরে আসছেন, এই ভাবটি ব্যক্ত করেছেন। 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে,' 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' প্রভৃতি

গানে এই ভাবটি প্রকাশিত। একটি গানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতে যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধ'রে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

রাধা আর কৃষ্ণের মধ্যে একজন বিমুখ হলে বিরহের পালা সুরু হয়। ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে কেউ যদি এতটুকু বিমুখ হয়, তা হলে প্রেমের মিলন হবে না। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যিনি আনন্দময়, আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ, তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দ রূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে। এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়; এখানে জোর খাটে না। রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এই জন্যে ভক্ত যেদিন আপনার অহংকারকে বিসর্জন দেয়, ইচ্ছে করে আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, সেই দিন মানুষের মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন। সেই জন্যেই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়ছে— এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্য বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন, সেই জন্যেই আমাদের চিত্ত ও সকল বিস্মৃতি সকল

অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকেই চাচ্ছে। বলছে ঃ আবিরাবীর্ম এধি।” [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৬, পৃষ্ঠা ৩৬৮]

বৈষ্ণব ধর্মের এই প্রেমের দিক, রসের দিকটা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষ করে আকর্ষণ করেছিল। বাল্যে বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় এর প্রভাব তাঁর কবিচিত্তের গভীরে প্রবেশ করেছিল—তাঁর কাব্যানুভূতি বৈষ্ণব ধর্মের কাছ থেকে রসপ্রেরণা লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীর আলোচনা স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, “উপনিষদের স্তন্যরসে রবীন্দ্রনাথ বর্ধিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যের মর্মস্থলে উপনিষদের তত্ত্ব বিরাজমান এ কথা বলিলেও, কেবলমাত্র উপনিষদ্ গীতিমাল্যের গানগুলির উৎস হইয়া উঠিতে পারিত না। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাব—আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া সাধক আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি, আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ—জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে ধ্যায়মান হইয়া মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায়। উপনিষদ্ যেখানে সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখিবার কথা বলিয়াছেন, সেখানেও আত্মস্থ হইয়া যোগস্থ হইয়া নিত্যোঽনিত্যানাং সকল অনিত্যের মধ্যে তাঁহাকে নিত্যরূপে ধ্যান করিবার উপদেশই দিয়াছেন। উপনিষদের সাধনা এই অন্তর্মুখীন ধ্যানপরায়ণ সাধনা। উপনিষদের ব্রহ্ম দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং। তিনি লীলারসময় বিশ্বরূপ ভগবান নহেন। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাস উপনিষদের মধ্যে নানা স্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে পরিস্ফুট আকার লাভ করিয়াছে এ কথা কোনো মতেই বলা যায় না। লীলাতত্ত্বের কথা এই যে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, সকল বস্তু, সকল বৈচিত্র্য, মানবজীবনের সকল ঘটনা, সকল উত্থানপতন সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু—সমস্তই শ্রীভগবানের রসলীলা বলিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে

হইবে। ভগবান অনাদি অনন্ত নির্বিকল্প হইয়াও প্রেমে অন্তের কাছে ধরা দিয়াছেন; সেই জন্যই তো কোথাও অন্তের আর অন্ত পাওয়া যায় না। 'সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।' সকল সীমাকে রন্ধ্র করিয়া সেই অনন্তের বাঁশি তাই নিরন্তর বাজিতেছে এবং তিনি বারবার জীবনের নানা গোপন-নিগূঢ় পথ দিয়া আমাদিগকে তাঁহার দিকে কত দুঃখ ক্লেশ কত আঘাত অভিঘাতের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সমস্ত জীবনের এই সুখ-দুঃখ-বিচিত্র পথ তাঁহারই অভিসারের পথ। এই পথেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলন, এই পথেই কত বিচিত্র রূপ ধরিয়া তিনি দেখা দিতেছেন। এই যে বিশ্ব ও মানবজীবনের সকল বৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলিয়া অনুভূতি, বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ইহাই সার কথা।" [কাব্য পরিক্রমা, পৃষ্ঠা ১১৫-১৬]

বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মপ্রভাবিত রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মানুভূতির পার্থক্য যে ছিল তা সহজেই অনুমেয়, রবীন্দ্রভাবনায় বৈষ্ণব ধর্মের সুরটুকুই শুধু ফুটে উঠেছে। কিন্তু কেবলমাত্র বৈষ্ণব ধর্মই রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনা বা লীলারসকল্পনার উৎস একথা বলা সঙ্গত হবে না। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আন্তর সত্তা এই প্রেমের কল্পনাকে, লীলার কল্পনাকে, আনন্দের কল্পনাকে গ্রহণ করেছিল—যেখানে তা সাধর্ম্যের পরিচয় পেয়েছে সেখান থেকেই তা সার গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রকল্পনার স্বীকরণশক্তি সত্যই অতুলনীয়।

এই প্রেমকল্পনার প্রসঙ্গে সুফী সাধকদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ হাফেজের কিছু কিছু কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি সুফীদের জীবন বা ভাবনার পরিচয় লাভ করেছেন, সুফী মতবাদ দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে আলোচকদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হলেও সুফী সাধক বা কবিদের মধ্যে যথার্থই গভীর রসানুভূতি বর্তমান; এই

বসানুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার সাজাত্য আছে। তিনি সচেতনভাবে সুফী ভাবধারার কথা চিন্তা করেছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এটি যে তাঁর অগোচরেও তাঁর কাব্যের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে একথা বলা অসংগত হবে না।

ববীন্দ্রনাথের এই গীতিগুচ্ছেব মধ্যে যে সুরটি আছে তার জন্য অনেকে পাশ্চাত্য মিস্টিক সাধকদেব সঙ্গে তাঁকে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মিস্টিক কিংবা মিস্টিক নয় সে বিষয়ে কিছু কিছু বিতর্ক আছে। কাব্যেব মধ্যে অতীন্দ্রিয় ভাব আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশেব জন্য অনেকে তাঁকে মিস্টিক কবি বলে থাকেন—আবার ববান্দ্রকাব্যে অনুভূতির দিক থেকে কোথাও অস্পষ্টতা বা আববণ না থাকায় তাঁব কাব্যে মিস্টিক ধর্ম যে অনুপস্থিত এ-কথাও বলা হয়েছে—তাঁর কাব্য অনুভূতিপ্রধান হলেও গুহ্য নয়, এই এ পক্ষেব প্রধান যুক্তি।

সাহিত্যে অর্ধস্ফুটতা বা অর্ধগূঢ়তাকেই সাধারণত মিস্টিকতা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পণ্ডিত সমাজ মিস্টিকতাব যে আকৃতিপ্রকৃতি নির্দেশ কবেছেন তা সাহিত্যিক মিস্টিকতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতেব জিনিস। শ্রীমতী আণ্ডারহিল 'An Introduction to Mysticism' গ্রন্থে যথার্থ মিস্টিকতার চারটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি এই—"True mysticism is active and practical, not passive and theoretical. It is an organic life-process, or something which the whole self does; not something which its intellect holds an opinion."—রবীন্দ্রনাথ সাধক ছিলেন না, সুতরাং active, practical বা organic life-process প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়—তবে তাঁর অনুভূতি passive বা theoretical-ও নয়। তাঁর উপলব্ধি বুদ্ধির দ্বার দিয়ে নয়, এইখানেই মিস্টিকদের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য।

দ্বিতীয় লক্ষণ—"Its aims are wholely transcendental and spiritual. It is in no way concerned with adding to, exploring, re-arranging or improving anything in the visible universe. The mystic brushes aside that universe even in its most super-normal manifestation. Though he does not, as his enemies declare, neglect his duty to the many, his heart is always set upon the changeless one"—রবীন্দ্রনাথের কল্পনার ধন তুরীয় হতে পারে কিন্তু ধর্মমুখীন নয়। পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৌকর্যসাধন তাঁর অধ্যাত্মবোধের লক্ষ্য ছিল না। 'এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে'—এই ধরণের ছত্র জীবনের মধ্যে ঈশ্বরানুভূতি সঞ্চারের প্রার্থনারূপেই গ্রহণীয়। শেষ বাক্যটি আমাদের দেবেন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তৃতীয় লক্ষণ—"This One is for the mystic, not merely the Reality of all that is, but also a living and personal object of love; never an object of exploration. It draws his whole being homeward, but always under the guidance of the heart"—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই লক্ষণটির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শ্রীমতী আণ্ডারহিল হৃদয়ের নির্দেশের কথা বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কল্পনার উৎস যেখানে সেটি মস্তিস্কও নয়, হৃদয়ও নয়। বস্তুত রবীন্দ্রসত্তায় এমন একটা অনুভবশক্তি আছে যা বুদ্ধিও নয়, আবেগও নয়—বোধি বললে তার কতকটা আভাস পাওয়া যায় এই মাত্র।

চতুর্থ লক্ষণটিতে মিস্টিক জীবনসাধনার কথা বলা হয়েছে—"Living union with this One—which is the term of

his adventure—is a definite state or form of enhanced life. It is obtained neither from an intellectual realization of its delight, nor from the most acute emotional longings. Though these must be present, they are not enough. It is arrived at by a definite and ardous physical process—the so-called Mystic Way—entailing the complete making of a character and the liberation of a new, or rather latent, form of consciousness, which impresses on the self the condition which is sometimes inaccurately called 'ecstasy', but is better named the 'Unitive State.'—ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে যে জীবনসাধনার কথা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথে তা কোনো দিনই প্রাধান্যলাভ করে নি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সচেতন আনন্দানুভব বা তীব্র আবেগময় আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সনির্দিষ্ট কঠোর জীবনপ্রণালী নেই। কাব্যের মধ্যে তাঁর আন্তর ভাবনার যতটা প্রকাশ হয়েছে জীবনের মধ্যে তার সাধনা অংশের অতি সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

সুতরাং গোঁড়া দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখলে রবীন্দ্রনাথকে মিস্টিক বলা চলবে না। তাঁর মধ্যে মিস্টিক সাধকদের সাধনার দিকটাই ছিল না। আবার রুডল্‌ফ্‌ অটো প্রমুখ দর্শনশাস্ত্রবিৎ শংকরের মতো বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদীকে যে দৃষ্টিতে দেখে মিস্টিক বলেছেন সেই দৃষ্টিতে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের দিক থেকে দেখলেও রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, বিশেষ করে তাঁর গীতিগ্রন্থ তিনটির মধ্যে অধ্যাত্মানুভূতির যে প্রকাশ ঘটেছে, পাশ্চাত্য মিস্টিক সাধকদের অনুভূতির সঙ্গে তার গভীর ঐক্য আছে সন্দেহ নেই। বস্তুত পাশ্চাত্য মিস্টিকরা সাধক রবীন্দ্রনাথ কবি—এই ভেদ টুকুই এঁদের মধ্যে অমিলের প্রধান কারণ।

রবীন্দ্রচিত্তে পাশ্চাত্য মিস্টিক সাহিত্যের কিছু কিছু প্রভাব

আছে—পাশ্চাত্য মিস্টিক সাহিত্য স্বভাবতই তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। পাশ্চাত্য মিস্টিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ছিল বলেই তাঁর কাব্যে অধ্যাত্মভাবনার একটি ত্রুটিহীন প্রোজ্জ্বল মূর্তি রূপলাভ করতে পেরেছে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রসাধনকলার কথা বিস্মৃত না হয়েও একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে পাশ্চাত্য মিস্টিক কাব্যের সঙ্গে পরিচয় থাকার জন্যই তাঁর গানগুলি পুষ্পেব মতো সহজ সৌন্দর্য আর সুরভি নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম জীবনের ধর্মসংগীতের সঙ্গে এগুলির মূলগত একটা প্রভেদ আছে।

তবে পাশ্চাত্য মিস্টিক সাধকদের কাছে ঋণী হলেও রবীন্দ্র-কল্পনা এ দেশ থেকেও সুপ্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছে। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে অনেক সাধকেব আবির্ভাব হয়েছিল। কবীর, দাদূ, মীরাবাই প্রভৃতি সাধক-সাধিকা গানের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মসাধনার গভীর তত্ত্বকে প্রকাশ করে গেছেন। মীরার ভজনে বৈষ্ণব রূপকল্পনা থাকলেও তার মধ্যে যে বাধাহীন হৃদয়ানুভব ব্যক্ত হয়েছে তাতে ভগবানের প্রতি ভক্তের চিরন্তন প্রেমের সুরটিই মূর্ত হয়েছে। কবীর বা দাদূর ভজনে সম্প্রদায়-সম্পর্কহীন ঈশ্বরের জন্য আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে।

মধ্যযুগের সাধকদের পরিচয় দিতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, "মধ্যযুগে এই সব সাধকসন্তরা ভগবানের সঙ্গে প্রেমের ব্যক্তিগত যোগই খুঁজেছেন। এই যোগের পথে বাহ্য আচার, শাস্ত্র, ভেখ প্রভৃতির প্রয়োজন তাঁরা মানেন নি। তাঁদের পক্ষে ভগবৎসাধনার কাছে আর সবই তুচ্ছ। স্বর্গের লোভ বা নরকের ভয়ে তাঁরা ধর্মের প্রবর্তনা স্বীকার করেন নি। প্রেমের ধর্মে ভগবানের সঙ্গে এমন একটি অভেদ ও সাম্য তাঁরা পেয়েছেন যা বেদান্তপ্রতিপাদ্য অভেদের চেয়ে অনেক সরস।·· যেখানে ভক্ত সেখানেই ভগবান। বাহ্য আচারে হবে কী, প্রেমেই উপজে প্রেম।'

ভগবানের স্বরূপই প্রেম। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় ক্রমে জন্মে রুচি আগ্রহ ও ভাব। ভাবে উপজে প্রেম। প্রেম হলেই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে যোগ হয় সহজ। এই সহজ যখন সিদ্ধ হয় তখনই জীবনের চরম সার্থকতা।" [ভাবতেব সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬]

মধ্যযুগের সাধকদের রচনার মধ্যে যে একান্ত প্রেম ব্যক্ত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। এই সাধকরা ধর্মসাধনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে কোনো বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান পদ্ধতির তালিকা রেখে যান নি—এঁদের রচনায় শুদ্ধমাত্র প্রেমের ভাবই ব্যক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যদি সাধক হতেন তা হলে অধ্যাত্ম-সাধনার ধ্রুব পদ্ধতি সন্ধান করবার জন্য উৎসুক হতেন। কিন্তু তাঁর কবিহৃদয় সাহিত্যের উপজীব্য রসকে উপেক্ষা করতে পারে নি। মধ্যযুগের সাধকদের গানে প্রেমের দিকটা, রসের দিকটা যে একটা পরিচ্ছন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল এটা এর প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রধান কারণ। ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত 'দাদূ'র ভূমিকায় তাঁর উক্তি স্মরণীয়—"এই সকল কাব্যে যে-রস এত নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সে হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমের রস। ইউরোপীয় সাহিত্যে আমরা ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কাব্যরচনা কিছু কিছু পড়েছি, বার বার মনে হয়েচে মেজরাপটাই কড়া হয়ে আওয়াজ করচে, তারটা তেমন বাজচে না, তাই খৃষ্টান-ধর্ম-সঙ্গীতের বইগুলি সাহিত্যের অন্দরমহলে ঢুকতে পারলে না, গির্জাঘরেই আটকা পড়ে গেল। আসল কথা, শাস্ত্রেব যে ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, তিনি সনাতনপন্থী ধার্মিক লোকের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে ; তাঁর জন্য অনেক মন্ত্রতন্ত্র ; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য করে দেখেচেন, যিনি অহেতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়। সত্যের পূজা সৌন্দর্যে, বিষ্ণুর পূজা নারদের বীণায়।"

মধ্যযুগের এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-বর্জিত সাধনার ধারাটি

বাংলাদেশের বাউল গানে যেন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সহজিয়া বা বাউলদের সাধনার প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন, তাঁদের গানের মধ্যে অধ্যাত্মসাধনার যে আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা একদিকে যেমন সম্প্রদায়নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য, অন্যদিকে তেমনই গভীর আর মর্মস্পর্শী। বাউলদের গানের সুরটিও প্রেমের। প্রথাকে অস্বীকার করে প্রেমের সহজ পথে ভগবানের দিকে যাত্রার আদর্শটি বাউলদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। বাউল বা সহজিয়াদের সাধনার মূলে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়িত রূপান্তর সহজ যান বা তান্ত্রিকতার প্রভাব আছে বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রেমের সুরটি যে কী ভাবে বাউলদের গানে ফুটে উঠেছে তার যথার্থ কারণ জানা যায় না। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের কথাটাও অনুমান মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের গানে ভক্ত আর ভগবান যেখানে দ্বৈত প্রেমলীলায় প্রেমিক আর প্রেমাস্পদরূপে প্রতিভাত হয়েছে, সেখানে বাউলদের গানের প্রেমের সুরটি ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রগীতির ভগবান অসীম হয়েও 'বিশ্ব-সাথে যোগে' বিহার করছেন। তিনি অনন্ত, কিন্তু সীমার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য তিনি উৎসুক। বাউলদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'Obscure Religious Cults' গ্রন্থে বলেছেন, "Through all his songs and poems Tagore sings of an Infinite Being, who is seeking His self-realisation,—and the best expression of Divine personality is through the human personality, and throughout the life-process of man there is going on this continual process of love-making between the human and the Divine. This human personality and the Divine personality, both of which remain combined in the nature of man are the 'I' and 'You,' the 'Lover' and the 'Beloved'

so much spoken of by Poet Tagore in his songs and poems. In singing of the 'I' and 'You' in man, between the man and the 'Man of the heart,' Tagore has been the greatest of the bāuls of Bengal" [পৃষ্ঠা ২১৪-১৫]

কিন্তু বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদী, বৈষ্ণব মিস্টিক সুফী বা মধ্যযুগের সাধক বা বাউলদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে তুলনা করা যায় না। তিনি সাধক নন এটা প্রথম কথা, দ্বিতীয়ত তিনি কবি। একদিকে যেমন কোনো নির্দিষ্ট সাধনপথে জীবনকে অগ্রসর করাবার আগ্রহ তাঁর ছিল না, অন্য দিকে জীবনের মধ্যে বিচিত্র রস আস্বাদ করবার জন্য একটা সহজাত ঔৎসুক্য তাঁর ছিল। উপলব্ধিব বিভিন্ন স্তরপর্যায় অতিক্রম করে তাঁর কাব্য এই গীতিগুচ্ছের মধ্যে সমে এসে পৌঁছেছে একথাও বলা চলে না—কারণ এর পরেও তাঁর বীণা বার বাব অভিনব রাগিণীতে বেজে উঠেছে। প্রথমনাথ বিশী অধ্যাত্মকবিতাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার একটি উপশাখা বলেছেন। ঠিক ঐভাবে বলা না গেলেও, অধ্যাত্মভাবনা যে তাঁর জীবনের বিচিত্র ভাবনার পরিণতি নয়, একটা উপাদান মাত্র, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। জীবনের সব রসই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্যই তাঁর অধ্যাত্মকবিতা জীবনের সব রসের সংশ্লেষে গড়ে উঠেছে, এইজন্যই অন্য ধারার ভক্তিমূলক কবিতা বা গানের সঙ্গে তার পার্থক্য দেখা যায়।

এই পার্থক্য রূপের দিকেও যেমন রসের দিকেও তেমনই প্রকট। সাধকরা যে সব ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন, সেগুলোর বিষয়-বস্তু বিচিত্র উপাদানে মণ্ডিত সাধনেতর জীবন থেকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র—সাধকরা সাধারণ জীবন থেকে সরে গিয়ে যেমন একটা ধর্মজীবন গড়ে তুলেছেন, তেমনই কাব্যের মধ্যেও একটি ধর্মভাবময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের কবিতায় বা গানে প্রেম বা ভক্তির

বেগ আর গভীরতা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কিন্তু তা যেন জীবনের একটি খণ্ডিত অংশের মধ্যেই সীমায়িত। সেইজন্য তার বস্তু বা ভাবের মধ্যে ভক্তি প্রাসঙ্গিক উপাদান, তার রূপায়ণে ক্বচিৎ আবেগময় প্রশান্ত সুর আর রসের মধ্যে আত্মনিবেদনের আকুলতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসংগীতে বস্তু ও ভাবের মধ্যে জীবনের বহুবিধ উপাদান বর্তমান, তার রূপায়ণে শিল্পসম্মত উল্লসিত ভঙ্গি পরিস্ফুট, তার রসের মধ্যে ভক্তিতন্ময়তার চেয়ে উপভোগের অনুভূতিই অধিকতর প্রকাশিত।

এই গানগুলি সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "এতাবৎকাল কবি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ও প্রেরণায় ঈশ্বরবিষয়ক অসংখ্য গান রচিয়াছেন, প্রকৃতির অর্চনা নানা সুরে ও ছন্দে গাঁথিয়াছেন; এই উভয় শ্রেণীর গীতধারা হইতে কবির এই নব গীতধারার সুর স্পষ্টতই পৃথক, তাহা স্বল্প প্রণিধানেই রসজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন।

এই গীতধারায় দেবতা ও প্রকৃতি এবং তাহার সঙ্গে মানব অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে—সৌন্দর্য ও সুন্দর একাঙ্গীভূত অদ্বৈত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে কবির যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতের (spiritual as opposed to religious) সূত্রপাত এই গীতাঞ্জলির পর্ব হইতে। সুতরাং এগুলিকে ব্রহ্ম-সংগীত বলা ভুল হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই নূতন গীতধারা আলোচনাকালে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে তিনি মুখ্যত স্বভাবকবি, প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভোগ তাঁহার আবাল্যের সংস্কার। ঈশ্বরকে অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া জীবনশিল্পী কবির স্বভাবে হইতে পারে না। তাই গীতাঞ্জলি প্রমুখ কাব্যে ঈশ্বর ও প্রকৃতি এমন আশ্চর্যরূপে ওতপ্রোতভাবে মিলিত, প্রিয়তমের বিরহ-বেদনা ছন্দে ও সুরে মুখর। সেইজন্য এখানকার গানে ঈশ্বর মুখ্য ও প্রকৃতি গৌণ; কিন্তু কবির জীবন যতই গভীরে প্রবেশ করিল, প্রকাশের ভাষা ততই রূপকে, সুরে,

ছন্দে, রহস্যে ভরিয়া উঠিল, ক্রমে ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে মুখ্য গৌণ ভেদ ঘুচিয়া গিয়া অখণ্ড রসবোধে সমস্ত চিত্ত প্লাবিয়া একাকার হইয়াছিল। সাধারণ পাঠকের কাছে মনে হইবে যে কবির পরযুগের কাব্যে ঈশ্বরের কথা স্পষ্ট নহে, সৌন্দর্যবোধ-স্পৃহা যেন সমস্ত দেহ মনকে আবিষ্ট করিয়াছে। পরবর্তী যুগের কাব্য ও কথাসাহিত্য সম্বন্ধে একশ্রেণীর সমালোচকের অভিযোগ এই যে কবির রচনার ধারা ক্রমশই অধ্যাত্মলোক হইতে প্রকৃতিলোকে বা অতীন্দ্রিয়লোক হইতে ইন্দ্রিয়লোকে নামিয়া পড়িয়াছিল; এবং তিনি জীবনকে শেষ পর্যন্ত আর্টরূপে সম্ভোগ করিয়াছিলেন,—প্রকৃতিই ক্রমশ গীতে ও কাব্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অভিযোগকারীদের ধারণা যে কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি পূর্বের ন্যায় তীব্র ও আন্তরিক ছিল না। আমাদের মতে এই অভিযোগ একদেশদর্শী; কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি ও তাঁহার কবিধর্মে তিনি প্রকৃতির পূজারী। শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় কবি যাহাকে ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন বাক্যে, গীতাঞ্জলিতে তাহাকে পাইলেন সুরে। জীবনের আরম্ভে কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী, জীবনের অন্তিমে সাধক রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসক। এই দুই অনুভূতি বিভিন্ন গুণধর্মী, একটি অজ্ঞানের পাওয়া, অপরটি রসের উপলব্ধি; আজ যাহাকে সুরে ও ছন্দে পাইতেছেন, তাহা রসের ধর্ম, বুদ্ধির ধর্ম নহে। এইজন্য আমরা কবির শেষদিককার গান বা কবিতাকে কেবলমাত্র সৌন্দর্য-সম্ভোগী আর্টিস্টের সৃষ্টি বলিয়া বিচার করিতে পারি না— উহারা কবির পরিপূর্ণ দৃষ্টিলব্ধ, অশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনাহীন সৃষ্টি।” [রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃষ্ঠা ২২৮-২৯]

শিল্পের সাধনা আর অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে একটা পার্থক্য চিরদিনই আছে—শিল্প মুখ্যত রূপকে অবলম্বন করেই আত্মপ্রকাশ করে আর অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য রূপের অন্তরালবর্তী গভীরতর সত্য। শিল্পীর কাছে রূপ অপরিত্যাজ্য, সাধকের কাছে রূপ অবান্তর। শিল্প

আর ধর্মের মধ্যে সংযোগ এর আগে কোথাও কোথাও হয়েছে ; কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্প হয় ধর্মের প্রয়োজনে নিজেকে ক্ষুণ্ণ করেছে, না হয় ধর্মকে বিকৃত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপ আর অরূপকে মেলাবার জন্য, শিল্প আর অধ্যাত্মসাধনাকে একীভূত করবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তাঁর কবিচিত্তে প্রকৃতি বা মানবমনের সৌন্দর্যের প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ আর অধ্যাত্ম-অনুভবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেনি। রূপসর্বস্ব শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবনের গভীরতম দেখবার প্রয়াস যে ব্যর্থ হয় তা 'রাজা' নাটকের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। সুদর্শনা রাজাকে রূপের মধ্যে দেখতে চেয়ে মহা অনর্থের সৃষ্টি করেছিল—দুঃখের দহনে তার রূপমোহ যে কী ভাবে রূপলেশহীন পরমধনের প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে তা এই নাটকের বিষয়বস্তু। কিন্তু নিছক রূপকামনাকে অসার্থক বলে নির্দেশ করলেও রূপের তৃষ্ণাকে তিনি অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত করতে চান নি। সুদর্শনা যেখানে রাজার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানে রূপের সীমা বিলুপ্ত হয়ে গেছে—কিন্তু সেই রূপহীন রাজার সঙ্গে অন্ধকার কক্ষে চিরমিলন তো নির্বিকল্প সমাধিরই নামান্তর—তা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত নয়। এইজন্যই তাঁর রাজা এইবার বলেছেন, "আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার পালা শেষ হল। এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এসো—আলোয়।"

চরম উপলব্ধির পর বিশ্বক্ষেত্রে বিচরণের আদর্শটি অবশ্য একেবারে নূতন নয়। উপনিষদের মধ্যে অনুরূপ ভাব অনেক জায়গায় আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে উপলব্ধি, অন্তরে উপলব্ধি আর অন্তরে বাহিরে মিলিত উপলব্ধি—এই তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। সুফী সাধকদের 'ঈশ্বর হইতে পর্যটন,' 'ঈশ্বরাভিমুখে পর্যটন' আর 'ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের সহিত পর্যটনে'র কল্পনাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ এই তৃতীয় উপলব্ধিটিকে কেবলমাত্র অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, রূপসাধনার ক্ষেত্রেও যে এটি অবশ্য

প্রয়োজনীয়—এই চিন্তাটি তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে' এই বোধটি রূপ আর অরূপের মিলিত উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজন। পাশ্চাত্য মিস্টিক সাধকদের চরম অবস্থা যে unitive stage সেখানেও পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনটাই মুখ্য—বিশ্বের মধ্যে তার প্রকাশের দিকটি সে তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের চেতনায় রূপময় বিশ্বও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ভগবান রূপলোকের অতীত হয়েও রূপের মধ্যে ধরা দিয়েছেন। সেইজন্যই কেবল রূপমুগ্ধ সুদর্শনাই রাজাকে বাইরে দেখতে চায় নি, রাজাও সুদর্শনাকে রূপময় সত্যরূপে দেখেছেন, সুদর্শনার রূপ তিনি কী ভাবে দেখতে পান সুদর্শনা সে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছেন, "দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।"—ভক্তের যেমন ভগবানকে প্রয়োজন, তেমনই ভগবানেরও ভক্তকে প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের এই বোধটির উপর বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে বৈষ্ণবের কল্পনা অধ্যাত্মজগতে সীমাবদ্ধ আর রবীন্দ্রকল্পনা বিশ্বময় প্রসারিত। বৈষ্ণবদের মধ্যে আছে ভক্তির মধ্য দিয়ে পরমানন্দ-মাধবের সাযুজ্য লাভের আদর্শ আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে বিশ্বের মধ্যে সেই আনন্দময় পুরুষ থেকে বিচ্ছুরিত আনন্দ-কাণকার অনুভবের পুলক-শিহরণ। বিশ্ব আর যে দেব বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত—দুই-ই তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়ে একটা গভীর আনন্দের হিল্লোল সঞ্চারিত করে দিয়েছে। ঠাকুরদার গানে আমরা এরই একটা প্রতিচ্ছবি পাই—

কী আনন্দ কী আনন্দ কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে ছন্দ।

কবিতা, গান বা নাটকের মধ্যে যে অনুভূতির প্রাধান্য, শান্তিনিকেতন-উপদেশমালায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে অবশ্য সযত্নরচিত বিশ্লেষণের বদলে অখণ্ড একটা বোধই বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কিন্তু অন্যত্র মননের রশ্মিপাত আছে, এখানে তাঁর অনুভূতিই প্রবল। যে আবেগের প্রেরণায় তিনি অজস্র কবিতা বা গান লিখেছিলেন সেই আবেগেই তাঁকে শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধগুলি লিখতে প্রণোদিত করেছিল। শান্তিনিকেতন উপদেশমালার প্রথম আটটি খণ্ডের একশো চারটি রচনা ১৩১৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ থেকে সুরু করে ১৩১৬ সালের ৭ই বৈশাখ এই পাঁচ মাসের মধ্যে লেখা হয়েছে। এর মধ্যে তিনি অনেক সময় একদিনে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন—যেটা গান বা কবিতা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি।

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি শান্তিনিকেতন মন্দিরে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত ভাষণ হলেও এর অধিকাংশ প্রবন্ধে সাময়িক উপলক্ষের ছাপ নেই। গীতাঞ্জলির প্রথম চোদ্দ-পনেরোটি গানেব পর এর আটটি খণ্ড লিখিত হয়েছে, এর পরে গীতাঞ্জলির কতকগুলি গান একসঙ্গে এসেছে, তার পর এই গ্রন্থের প্রবন্ধ আর গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির গান প্রায় সমকালে রচিত হয়েছে। প্রথম আটখণ্ডের প্রবন্ধগুলি গানের সগোত্র না হলেও গীতাঞ্জলির বীজ এগুলোর মধ্যে নিহিত। এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তাঁর যে অনুভূতিময় চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে তাই তাঁকে গীতধারা রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণগুলি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের রচনায় অভিজ্ঞতার গভীরতাই লক্ষ্যবস্তু, রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনুভূতির উচ্ছ্বসিত প্রকাশই ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তাঁর এই রচনাগুলির মধ্যে অনুস্যূত হওয়ায় এগুলির শিল্পগত মূল্যও আছে।

শান্তিনিকেতনের একাধিক প্রবন্ধের মধ্যে উপনিষদের মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ উদ্ধার করে তার মর্মটি ব্যক্ত করা হয়েছে। সাধারণত যে ভাবে মন্ত্র ব্যাখ্যা করা হয় রবীন্দ্রনাথ সে ভাবে মন্ত্রের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করেন নি—তিনি মন্ত্রের ভাবটুকু যেন হৃদয়ে গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। মন্ত্রের মধ্যে অতি গভীর সত্য নিহিত থাকলেও প্রতিনিয়ত আবৃত্তি বা পাঠের ফলে অভ্যাসের জড়তা এসে গেলে সেই সত্য আমাদের কাছে মৃত হয়ে পড়ে। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের যে সব মন্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেগুলোকে বাহ্যত আবৃত্তি বা পাঠ না করে তিনি যেন সেগুলিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যের মধ্যে মন্ত্রের উপলব্ধি নবজন্ম গ্রহণ করেছে। এই রচনাগুলিকে মন্ত্রের ধ্যান বলা অসংগত হবে না—অধ্যাত্মরসপিপাসু কবি রবীন্দ্রনাথের উপাসনা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী আরম্ভ হয়েছে সংসারের জাল থেকে মুক্তির আকুলতা নিয়ে। 'জড়তার কুণ্ডলীর পাকে'র চেয়ে কবি সংশয়কেও শ্রেয় বলেছেন, কারণ 'যথার্থ সংশয়ের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা।' ঈশ্বরকে জীবন থেকে বাদ দেওয়ায় আমরা যে কী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি তা আমরা বুঝতে পারি না কারণ ঈশ্বরের অভাববোধ আমাদের সংসারের অভাববোধের মতো নয়। কিন্তু যখন আমরা একবার অস্ফুটভাবেও তাঁর স্পর্শ পাই, তখন বাহ্য উপকরণের দিকে টান আর থাকে না। এই স্পর্শ আমাদের বাইরের কোনো লাভ নয়।—"আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৪৫৫]—এই প্রসঙ্গে কবি আধ্যাত্মিক

সাধনার চরম লক্ষ্য নির্দেশ করে 'তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি' এই মন্ত্রাংশটি উদ্ধার করেছেন।

পাপের বাধাকে অতিক্রম করে, দুঃখের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মার সাধনাকে অগ্রসর' করাতে হবে। কিন্তু আরও একটি পদার্থ আছে—সেটি প্রেম। আমাদের সাধনা বা মুক্তির চরম লক্ষ্য প্রেম বা সেই প্রেমস্বরূপ। সেই প্রেমস্বরূপ 'নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন।' তাঁর সঙ্গে প্রেমের মিলন হয় না বলেই আমাদের জীবনে এত বেসুর। প্রেম শান্তির চেয়ে বড়ো। এই উপকরণবহুল জগৎসংসারের মাঝখানে সেই প্রেম স্বরূপ অমৃতের জন্য মানুষের মনে যে আকূতি তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্' এই মন্ত্রাংশটি স্মরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রার্থনামন্ত্রের যে সংক্ষিপ্ত অথচ আবেগময় রূপায়ন তিনি করেছেন তাতে তাঁর হৃদয়ের সুরটি ফুটে উঠেছে।—"হে সত্য, সমস্ত অসত্য থেকে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে, হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে, হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্ন-রাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তা হলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম এধি—হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি তো চির-প্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হ'ক। হে রুদ্র, হে ভয়ানক—তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তোমার যে প্রসন্ন সুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্—তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো,

আমাকে নিত্যকালের মতো বাঁচাও—সেই তোমার প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৪১৭]

প্রেমের সাধনা আমাদের লক্ষ্য হলেও তার মধ্যে বিকারের আশঙ্কা আছে। ভক্তি সাধনা যে এদেশে একসময় রসের প্রমত্ততা এনেছিল সে কথা তিনি বিস্মৃত হন নি। সেইজন্য তিনি বলেছেন, "আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে—তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। তাতে সংযম থাকবে, সুবিবেচনা থাকবে এবং সৌন্দর্য থাকবে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৪১৮]

আমাদের শক্তির সাধনা 'স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টা'কেই চরম বলে গ্রহণ করে, কিন্তু সেই লক্ষ্য কত ক্ষুদ্র। কিন্তু 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন'—'ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনো কালেই আর ভয় পান না।' প্রেমেই মানুষের চরম সার্থকতা। আমাদের মধ্যে প্রেমের জাগরণ অবশ্য প্রয়োজন, কারণ, প্রেমের মধ্যেই, আনন্দের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন হতে হবে। তিনি প্রেমময়, আনন্দময়।" বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে, সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্যই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, পৃষ্ঠা ৪২৬]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিশ্বের মধ্যে যে অনন্ত সৌন্দর্য তরঙ্গিত এই বোধটি রসরূপে ব্যক্ত হয়েছে। বিশ্বের রূপলোক যে সেই অপরূপ থেকে জাত, তাতেই স্থিত, তাতেই লীন—এই প্রত্যয়টি এখানে স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, "চারিদিকেই রূপ—কেবলই এক

রূপ থেকে আর একরূপের খেলা ; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাইনে ভেবেও পাইনে। রূপের ঝরণা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্ত রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্ত রূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে।" [রবীন্দ্রবচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৪৮৪] —কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ নয়, সমগ্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তাঁর আনন্দের তরঙ্গ এসে লাগছে। 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' বিশ্বসংগীত প্রতিনিয়ত তাঁর মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে বিশ্বময় স্পন্দিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। গায়ত্রীমন্ত্র স্মরণ করে তিনি বলেছেন, "গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ তাঁর তেজ তাঁর শক্তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধী রূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে।" [রবীন্দ্রবচনাবলী ১৩, পৃষ্ঠা ৪৮৬]

ঈশ্বরের দিক থেকে অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত প্রেম আমাদের দিকে অনুক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের সেই সৌন্দর্যের, সেই প্রেমের সাড়া দিতে হবে। যখনই আমাদের মনে সৌন্দর্যবোধের উদ্রেক হবে তখনই আমরা তাঁর সৌন্দর্যকে প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারব। যখন আমাদের হৃদয়ে যথার্থ প্রেম জাগ্রত হবে, তখনই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিণয়, আমাদের অনন্ত মিলন। তাঁর যে আনন্দ তার সুরটুকু নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি সৌন্দর্যে বিলসিত। কিন্তু মানুষের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে, একটি অহং আছে—সেই অহংটি মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে রেখেছে। সেই অহংটি আপনাকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করে চলেছে—এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই অহং প্রবল হয়ে উঠে মিলনের সুরটি হারিয়ে ফেলেছে। এই অহংকে বিলুপ্ত করে যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হবে

তা নয়—আমাদের এই অহং যখন প্রেমের মধ্যে জেগে উঠবে তখন সব অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যাবে। একটা সীমা একটা আধার না হলে যে অসীমের প্রেম অনন্তের আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

প্রেমের সাধনায় ঈশ্বরকে লাভ করবার কথা নতুন নয়। বৈষ্ণব ধর্মের কথা বাদ দিলেও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে প্রেমের দিকটাতে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইভাবে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যমাধুর্যকে 'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ' বলে সৌন্দর্যরসে ডুবে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বিশ্বের সর্বত্র তাঁর প্রকাশ দেখতে সমুৎসুক। বিশ্বময় ঈশ্বরকে অনুভব করবার আদর্শ হিসাবে তিনি উপনিষদের একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

"তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মতো পৃথিবীতে এসে আবার স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়, নমো নমঃ; তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার; সর্বত্রই তাঁকে নমস্কার।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, পৃষ্ঠা ৫০৯]

পৃথিবীর ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ধর্ম বার বার রসের মূর্তি প্রকাশ করে সমস্ত বাঁধন ভেঙে দিয়েছে, সমস্ত খর্বতা প্রবল বন্যায় ভেসে গিয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম ইহুদীধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনকে প্রেমভক্তিরসের বন্যায় ডুবিয়ে

দিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কঠোর তত্ত্ব আছে, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে মৈত্রীকরুণার বাণী আর 'বুদ্ধদেবের হৃদয়প্রসার' আছে তা বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠান অপসারিত করে মানুষের হৃদয় জয় করেছে, তত্ত্বকথা বা আচারসর্বস্বতার মোহ বার বার এসেছে আর নানক, রামানন্দ, কবীর বা চৈতন্যদেবের মতো মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে 'রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে' মানুষকে একটি প্রেমের সাধনায় মেলাতে চেয়েছেন।

ধর্মসাধনার মূলে প্রেম যে অবশ্য প্রয়োজন তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। "ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল, তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দ বেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে, তখন কোনো একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন-সাধন, তখন সাধককে একথা মনে রাখতে হবে যে কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর কিছুতেই হয় না।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫, পৃষ্ঠা ৪৪৯]

কিন্তু শুধুমাত্র প্রেমভক্তির চর্চায় আতিশয্যের আশঙ্কা আছে;

সে দিকেও তিনি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। ভক্তিরস যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন তাতে জীবনের সামঞ্জস্য হারিয়ে যায়। তখন কর্মের প্রতি মানুষের উপেক্ষা আসে, জ্ঞানকে সে নস্যাৎ করে দিতে চায়। নিজের মনে ভক্তির একটা কৃত্রিম মাদকতা সৃষ্টি করে সে তার মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসে। এমন মনে হয় যে এই ভক্তিটাই আসল; যাঁর জন্য ভক্তি, যাঁর জন্য প্রেম, তাঁকে জীবনে উপলব্ধি করবার সাধনা তখন আর থাকে না। একটা ঘোর তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতার চূড়ান্ত বলে মনে হয়—তখন ভাবের আবেগে দিশাহারা হয়ে অসত্যকে নিয়ে মেতে থাকলেও ক্ষতিবোধ থকে না। এই জ্ঞানহীন কর্মহীন ভক্তির নেশা জাতিকে বহুকাল ধরে পঙ্গু করে রেখেছে। এই জ্ঞান-লেশহীন ভক্তিরসলোলুপতার কাছে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ তিরস্কৃত, একটা অস্পষ্ট ভাবকুহেলিকায় জাতির চিত্ত আচ্ছন্ন।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান কর্ম আর ভক্তির সামঞ্জস্য-সাধনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। এই জগতের কর্মকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, তাহলে তা মানুষকে বদ্ধ করবে না। ঈশ্বরের মধ্যে প্রেম তো আছেই, 'কিন্তু পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ।'—তাঁর বিভিন্ন ক্রিয়া আছে, তিনি জড় নন, তাঁর জ্ঞানক্রিয়া আর বলক্রিয়া দুই-ই স্বাভাবিকী। যে জ্ঞানহীন তার জীবন অর্থহীন আর যে কর্মহীন সে জড়তায় আবদ্ধ। উপনিষদ বা গীতায় জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সামঞ্জস্য সাধন করা হলেও আমাদের দেশে অনেক বারই কর্মকে অধ্যাত্মসাধনের বাধা বলে মনে করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কর্মকে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেছেন। ঈশ্বরের ক্রিয়াকে স্বাভাবিকীরূপে গ্রহণ করলে কর্ম সহজ হয়ে যায়। বস্তুত যখন আমরা 'অন্তরের স্ফূর্তিবশত' কর্ম করি তখন তা আমাদের বাঁধতে পারে না। কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরোয় না তখন তা ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। "অতএব কর্মকে

স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্মই করি—তা ছোটই হ'ক আর বড়োই হ'ক, সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম সত্য কর্ম, মঙ্গল কর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, পৃষ্ঠা ২৯৪]

রবীন্দ্রনাথ এই বন্ধনহীন কর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন—পতিব্রতা পত্নীর সংসার। সতী স্ত্রী যে স্বামীর সংসারে কাজ করাকে ভার বলে মনে করে না তার কারণ স্বামীর প্রতি তার প্রেম। এই প্রেমটুকু আছে বলেই সে দাসী নয়, দেবী। তার কর্ম স্বামীর প্রতি প্রেমেরই প্রকাশ। আমাদেরও ঐভাবে অন্তরে প্রেম আর আনন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে সমস্ত কাজ করতে হবে। এইজন্যই কর্মের লক্ষ্যকে স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যেতে হবে। আমার কাজ নয়, তাঁর কাজ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মাণ সমর্পয়েৎ'—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের এই আদর্শটিও স্মরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমসম্পর্কটি প্রাধান্য লাভ করেছে, তবে ঈশ্বরকে পিতার মূর্তিতে দেখাও তাঁর কল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি এই পিতার বোধটি 'পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু' ব্রাহ্মধর্মের এই মন্ত্র থেকে পেয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে ঈশ্বরকে যে পিতৃরূপে কল্পনা করা হয় এটিকে অনেকে মুখ্যত খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রভাবজাত বলে নির্দেশ করেছেন। এই অভিমত পুরোপুরি অমূলক না-ও হতে পারে, কিন্তু এই পিতৃ-কল্পনার মূলে বৈদিক মন্ত্রের প্রভাবও যে রয়েছে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এ বিষয়ে বৈদিক মন্ত্রের কাছেই যেটুকু ঋণী—খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব তাঁর এই কল্পনায় পড়ে নি।

তিনি বলেছেন যে এই জগৎকে আমরা পিতৃনিকেতন বলে

জানি না বলেই আমাদের এত অপচেষ্টা, এত ক্ষতি হাহাকার। যখন আমাদের এ বোধ জাগে যে আমাদের পিতা আছেন, তাঁরই আনন্দভবনে আমরা বাস করছি তখন আর আমাদের ক্ষয়ক্ষতির ভাবনা থাকে না, আমাদের অন্তরে একটা নির্ভর জেগে ওঠে, আমাদের সমগ্র জীবন তখন 'রসের ভারে নম্র নত' হয়ে নমস্কারে লুটিয়ে পড়তে পারে।—আমাদের দেশে ঈশ্বরকে 'মা' বলে যে ডাক তার মধ্যে যে গভীর স্নেহ আছে তা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পিতার স্নেহ পূর্ণতর। মাতার স্নেহের মতোই পিতার স্নেহ সন্তানকে লালন করে, পালন করে, তার চেয়ে বেশি এইটুকু যে তা সন্তানকে জীবনক্ষেত্রে বিচরণের উপযোগী করে তোলে। মাতার স্নেহ অবগুণ্ঠিত করে, পিতার স্নেহ জগতে মুক্তি দেয়।—সংস্কৃত 'পিতরৌ' শব্দে পিতামাতা দুজনকে একসঙ্গে বোঝায়। রবীন্দ্রনাথ বৈদিক মন্ত্রের এই পিতৃসম্বোধনে পিতা মাতা দুইয়ের সমাবেশ আছে বলে নির্দেশ করেছেন। মাতার অবারিত স্নেহ আর পিতার স্নেহ-মণ্ডিত অথচ সুকঠোর শিক্ষা এই দুই-ই আমরা বিশ্বপিতার কাছ থেকে পেতে পারি। পিতার বোধ আমাদের সংশয় ঘুচিয়ে দেবে, তারপর আমাদের জীবনসাধনায় অগ্রসর করে দেবে।

আমাদের অন্তরে প্রেম যে জাগ্রত হয় না তার মূল কারণ আমাদের বিশ্বাস নেই। অন্তরে গভীর প্রত্যয় জাগ্রত হলেই প্রেম মুকুলিত হবে। সাধনার অনভ্যাসও আমাদের বাধা। আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, বাজে কাজের বোঝাতেই জীবন ভার হয়ে ওঠে—সেইজন্য চাই সংহরণ। সাধনার প্রথম ক্ষেত্রে নিষ্ঠাই একমাত্র সহায়—সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা একমাত্র নিষ্ঠাই সহ্য করতে পারে। আমাদের চিত্ত বিমুখ, ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সৌখিন রকমের যোগসূত্র রচনা করতে পারলেই আমরা যথেষ্ট হল বলে মনে করি। সমাজ-বিহারের জন্য আমাদের আশৈশব শিক্ষা ও সাধনা চলে—ব্রহ্মবিহারের জন্যও তেমনই সাধনা দরকার। সংসারের বিভিন্ন জালে

নিজেকে আবদ্ধ রেখে, আমাদের অন্তরে ভগবৎপ্রেম কেন জাগ্রত হল না, আমাদের কণামাত্র সাধনা কেন ফলবতী হল না সে প্রশ্ন নিরর্থক।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জাগাতে হলে শীলসাধনার প্রয়োজন আছে। উদ্দেশ্য প্রেম, কিন্তু যে চিত্ত আবিলতায় আচ্ছন্ন তাকে কল্যাণব্রতে সংস্কৃত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্মের শীলব্রতের আলোচনা করে চরম লক্ষ্য ব্রহ্মবিহার বা অপরিমাণ মৈত্রীভাবনার মূলে এটি প্রয়োজন বলে নির্দেশ করেছেন।—"একটা কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে, আর একদিকে স্বরূপলাভ করছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিল-লাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, পৃষ্ঠা ৩৭৪]

যখন অন্তরে ব্রহ্মের অনুভূতি জাগবে তখন সব সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না চিত্তে সেই বোধের আবির্ভাব হচ্ছে ততদিন মঙ্গলকর্মে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলনের অবকাশ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর এই বিশ্বজগৎ নিয়মে বাঁধা, কর্মে অবহেলা করে সেই নিয়ম ভঙ্গ করলে মহতী বিনষ্টি

ঘটবে। নিয়মকে মেনে তাকে অতিক্রম করতে হবে—কল্যাণ কর্মের সাধনাই ঈশ্বরের প্রতি প্রেমকে গাঢ়তর করে তুলবে।—তবে কর্মের নেশা জাগলে চলবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমে মিলনই যে লক্ষ্য এ কথা বিস্মৃত হলেই কর্ম বন্ধন হয়ে উঠবে, শীল আচারমাত্র হয়ে উঠবে।

শান্তিনিকেতন উপদেশমালার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জড়তা, ভ্রান্তি, দ্বিধা দূর করবার জন্য বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমে মিলনের সুরটি সব চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে দ্বৈত্য-অদ্বৈত নিয়ে আলোচনা, ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ, ধর্মের মতসর্বস্বতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিচার আছে বটে কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা বা উপদেশের চেয়ে তাঁর অধ্যাত্মরস-পিপাসাই এখানে স্ফুটতর। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির মধ্যে যা গানে ব্যক্ত এখানে তাই প্রবন্ধের দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সময় তাঁর জীবন বিচিত্র কর্মের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় তাঁর রচনার মধ্যে পূর্ণতর জীবনাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে জীবনের মধ্যে অধ্যাত্মরসানুভূতির একটা গভীর প্রেরণাও জেগেছে। গীতিগুচ্ছের মধ্যে যে জিনিসটি প্রবল, এখানেও তাই মূল কথা—সেটি কবির ব্যক্তিত্ববোধ। তিনি ব্রহ্মকে বিরাট আর সেই তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলে নিজেকে ব্রহ্মে বিলীন করতে চান নি। তাঁর নিজেরও যে একটি ব্যক্তিত্ব আছে, বিশেষত্ব আছে, ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে অন্তহীন বৈচিত্র্যে অপরিসীম মাধুর্যে মণ্ডিত, এই বোধটি তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনসচেতন কবির পক্ষে এই ধরণের ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত রসানুভূতির আকাঙ্ক্ষাই স্বাভাবিক।

এই ব্যক্তিত্বের দিকটা প্রবল হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনায় পাপবোধ উগ্র নয়। ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তায় পাপবোধ যে প্রাধান্য

লাভ করে নি রবীন্দ্রনাথ সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশ্চাত্য ধর্মসাহিত্যে ধর্মের যে ভীষণ মূর্তি কল্পিত হয়েছে, অনুতাপের যে জ্বলন্ত দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে তা এ দেশে নেই। এ দেশে নরকের কিছু কিছু শিশুসুলভ যে কল্পনা আছে তা অমার্জিত অশিক্ষিত মনের রচনা। প্রাচীন ধর্মসাহিত্যে ধর্মবোধের অভাবই মহতী বিনষ্টি বলে নির্দেশিত হয়েছে, পাপের বিস্তৃততর বিবরণ এই-জন্যই সেখানে নেই। 'বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব' পাপবিনাশের এই সাধারণ মন্ত্রই সেখানে উচ্চারিত হয়েছে—পাপের ক্ষমা নয়, পাপের মার্জনাই কল্পিত হয়েছে। পূর্ণতার বোধ বৈদিক বা উপনিষদ সাহিত্যে এত পুষ্ট যে অভাবাত্মক পাপবোধ সেখানে একরকম উপেক্ষিতই হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পাপকে ব্যক্তিগত না বলে মানবসমাজগত বলেছেন। যে পাপী সেই যে পাপের ফল ভোগ করে তা নয়। মানবসমাজে এক জায়গায় বিকার দেখা গেলে তার সুদূরপ্রসারী ফল হতে পারে। অসতের পাপে সতেরই বেদনা। পাপকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির জীবন থেকে দূরীভূত করবার প্রার্থনা না করে, এইজন্য ঋষি বিশ্বের পাপ মার্জনা করবার প্রার্থনা করেছেন।

পৃথিবীর সব ধর্মমতের একটা নিষ্প্রাণ দেহ আছে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব সজীব পদার্থ। যদি সেই ব্যক্তিত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করা যায় তা হলে তা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বা বহুবিচিত্র হলেও কারও পক্ষে প্রতিকূল হয় না। সাধারণ ধর্মনীতি সকল দেশেই প্রায় অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিগত যোগের কল্পনা করেছেন অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে তা বিনা বাধায় সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে। অয়কেন বা স্টপফোর্ড ব্রুক যে সর্বজনীন ধর্মাদর্শের কল্পনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ তারই সগোত্র।

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের অতিশয়িত কর্ষণার ফলে বাইবেলের অনেক কথা কাল্পনিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে

অনেকের ধর্মের উপর বিশ্বাস ঘুচে গেছে। অনেকে আবার প্রেততত্ত্ব-প্রমুখ অলৌকিক বিষয় অবলম্বন করে ধর্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। এদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের শক্তি দিন দিন বেড়ে উঠছে। অথচ কী অন্তরের কী বাইরের শান্তি দিন দিন সুদূরপরাহত হয়ে উঠছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই শক্তিপ্রমত্ততার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষের আরণ্যক সভ্যতার গভীর শান্তির তুলনা করেছেন। প্রাচীন ভারতের প্রতি কবির অনুরাগ পূর্বযুগে প্রচুর পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে, এখন আরণ্যক সৌন্দর্যের কল্পনা তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর বিশ্বাস এই যে, "নগর-স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, পৃষ্ঠা ৪৭৯] অন্তরতর সত্যকে বাহ্য শক্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না—প্রশান্ত চিত্তের মধ্যেই তার প্রকাশ সম্ভবপর। পাশ্চাত্য জগতে শক্তির যে প্রমত্ততা দেখা দিয়েছে তা প্রশমিত হলেই শান্তি হতে পারে—তখনই মানুষ জীবনের মধ্যে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্‌কে লাভ করতে পারে।

এ দেশেই হোক আর ইউরোপেই হোক, মানুষ যখন ধর্মকে কোনো একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে তখনই তার পতন ঘটে। মানুষের চরম সত্য অনড় হয়ে বসে নেই—যুগে যুগে তার কী বিচিত্র বিকাশ! মানুষের পাওয়ার শেষ নেই। সে যদি 'পেয়ে গেছি' বলে চুপ করে বসে থাকে তাহলে জড়তার মধ্যে তার পতন হবে। "কালে কালে মহাপুরুষরা কী দেখান! তাঁরা দেখান যে, তোমরা যাকে ধর্ম বলে ধরে রেখেছ ধর্ম তার মধ্যে পর্যাপ্ত নন। মানুষকে মহাপুরুষরা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন, তাঁরা বলেন, চলতে হবে। কিন্তু মানুষ তাঁদেরই আশ্রয় করে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে

যায়, আর চলতে চায় না। মহাপুরুষরা যে পর্যন্ত গিয়েছেন তারও বেশি তাঁদের অনুপন্থীরা যাবেন, এই তো তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু তারা তাঁদের বাক্য গলায় বেঁধে আত্মহত্যা সাধন করে। মহাপুরুষদের পথ হচ্ছে পথ, কেবলমাত্র পথ। তাঁরা সেই পথে চলেছিলেন এইটেই সত্য॥ সুতরাং পথে বসলে গম্য স্থানকে পাব না, পথে চললেই পাব। উপরের থেকে সেই চলার ডাকটিই আসছে। সেই বাণীই বলছে: তুমি বসে থেকে কিছু পাবে না; চলো, আরও চলো; আরও আছে, আরও আছে। মানুষের ধর্ম চলছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। (ধর্ম আমাদের কোনো সীমাবদ্ধ জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে না, ধর্ম অসীমের পরিচয় দিচ্ছে। পাখি যেমন আকাশে ওড়ে এবং উড়তে উড়তে আকাশের শেষ পায় না তেমনি আমরা অনন্তের মধ্যে যে অবাধ গতি রয়েছে তাতেই চলতে থাকব। পাখি পিঞ্জরের মধ্যে ছটফট করে তার কারণ এ নয় যে, তার প্রয়োজন সেখানে পাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশিকেই পাচ্ছে না। মানুষেরও তাই চাই। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের ধর্ম হচ্ছে অনন্তে বিহার, অনন্তের আনন্দকে পাওয়া। মানুষ যেখানে ধর্মকে বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ করছে সেখানে যে ধর্ম তাকে মুক্তি দেবে সেই ধর্মই তার বন্ধন হয়েছে। য়ুরোপে ধর্ম যেখানে তাকে বেঁধেছে সেইখানেই মুক্তির জন্য য়ুরোপ ক্রন্দন করছে।) Onward cry মানুষের cry।”

রবীন্দ্ররচনাবলী ১৬, পৃষ্ঠা ৪৮৮-৮৯]

ফল

একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এই কথাটা মনে জেনো, ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব—যেমন আগুনের ধর্মই অগ্নিত্ব, পশুর ধর্মই পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।" [পত্রধারা, প্রবাসী ১৩৩৯ ভাদ্র] এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহুবার বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মকে তিনি কোনো কাল্পনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে চান নি—মানুষের অস্তিত্বের মূলে তিনি তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষের জীবনের বাহির আর অন্তর তাঁর কল্পনায় স্থান পেয়েছে—একদিকে তার জীবনচর্যা অপরদিকে অধ্যাত্মচেতনা এই দুটিকেই তিনি ধর্মের মূল বলেছেন।

মানুষের অধ্যাত্মচেতনা তার শ্রেষ্ঠ ধন। এই চেতনার মূলে রয়েছে সেই শক্তি যা তাকে পশু থেকে স্বতন্ত্র করেছে। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে অথর্ববেদের একটি মন্ত্র উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ উদ্‌বৃত্ততাকে মানবজীবনের পরম সম্পদ বলে নির্দেশ করেছেন। মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা কেবলই তার প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যায়। এই উদ্‌বৃত্ত পদার্থই তার চিত্তকে বিচিত্র বিষয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার প্রেরণা দিয়েছে। 'The Religion of Man' গ্রন্থের প্রথম তিনটি প্রবন্ধে তিনি মানুষের এই উদ্‌বৃত্ততার সন্ধান করতে করতে জীবধারার আদি থেকে সুরু করে মানুষ পর্যন্ত এসেছেন। অপরিমেয় যুগব্যাপী বিবর্তনের ফলে মানুষের দেহ আজ সুঠাম ভঙ্গিটি লাভ করেছে। তেমনই যুগযুগব্যাপী বিবর্তনের ফলে সে তার এই উদ্‌বৃত্ত শক্তির অধিকারী হয়েছে। বিশ্বের মূলস্থ সৃজনীশক্তি থেকেই এই উদ্‌বৃত্ত শক্তি বিকশিত। এই শক্তি একদিকে যেমন মানুষকে বিচিত্রের সন্ধানে বার করেছে, আর একদিকে তেমনই তার অন্তরে গভীর আত্মজিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছে। তার এই জিজ্ঞাসাই তার অধ্যাত্মচেতনার মূল—এই জিজ্ঞাসার উত্তর তার এখনও অনায়ত্ত। 'The Religion of Man' গ্রন্থে তিনি

বলেছেন, "Man has taken centuries to discuss the question of his own true nature and has not yet come to a conclusion. He has been building up elaborate religions to convince himself, against his natural inclinations, of the paradox that he is not what he is but something greater. What is significant about these efforts is the fact that in order to know himself truly Man in his religion cultivates the vision of a Being who exceeds him in truth and with whom also he has his kinship. These religions differ in details and often in their moral significance, but they have a common tendency. In them men seek their own supreme value, which they call divine, in some personality anthropomorpic in character. The mind, which is abnormally scientific scoffs at this ; but it should know that religion is not essentially cosmic or even abstract; it finds itself when it touches the Brahma in man; otherwise it has no justification to exist." [পৃষ্ঠা ৬৩]

পরিণত জীবনের এই তত্ত্ববোধটির সূত্র 'গীতগুচ্ছ' বা 'শান্তিনিকেতন' প্রমুখ গ্রন্থে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যে গূঢ় সত্য আছে তা সমস্ত স্থানিক বা কালিক সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে সার্বিক মূর্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু ধর্মের আর একদিকে যে জীবনচর্যা আছে তা বিচিত্র, জটিল। চরম সত্য সম্পর্কে সব ধর্মই প্রায় একই কথা বলে, কিন্তু ধর্মের যে রূপটি জীবনের মধ্যে প্রকাশিত সেখানে মানুষের চিন্তায় কর্মে বিরোধের সীমা নেই।

এই বিরোধ বা বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের বাইরের দিকটা তাঁর ধর্মচিন্তা থেকে বাদ দেন নি, বরং বাহ্য জীবনকে শুদ্ধমাত্র অনুভূতি বা জ্ঞানের চেয়ে বড়ো স্থান দিয়েছেন। ভারতে যোগসমাধির যে আদর্শ আছে তাতে চিত্তের বিশুদ্ধতম অবস্থা যে সম্ভব বা এই অবস্থায় ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ যে কাল্পনিকতা নয় তা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছেন, "Without disputing its truth I maintain that it may be valuable as a great psychological experience but all the same it is not religion, even as the knowledge of the ultimate state of the atom is of no use to an artist who deals in images in which atoms have taken forms." [The Religion of Man, পৃষ্ঠা ১১৮]

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মকল্পনার মধ্যে সংকীর্ণতা নেই— তা ভাব-কল্পনা হিসাবে বিশুদ্ধ, তার আবেদন সর্বজনীন। বাস্তবিক পক্ষে সব ধর্মেই সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে একটা উচ্চতর স্তর থাকে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-অনুভূতি এই স্তরের বস্তু। কিন্তু কেবলমাত্র এই সুনিবিড় উপলব্ধির মধ্যেই তাঁর চিত্ত পরিতৃপ্ত থাকে নি। ধর্মের বাইরের দিকটাতেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। জীবনে আচরিতব্য ধর্মকে তিনি সংযত চিত্তে বিচার করে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। যেখানে বুদ্ধির সঙ্গে প্রথা বা প্রচলিত আচার বা বিশ্বাসের বিরোধ ঘটেছে সেখানে তিনি ধর্মের নামে বুদ্ধিকে খাটো করতে রাজি হন নি। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের ফলে বাইবেলের অনেক কথা নিছক কল্পনা বলে প্রতিপন্ন হওয়ায় খ্রীষ্টান জগতে যে ধর্মসংকট দেখা দিয়েছে, তা তাঁর অগোচর ছিল না। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে-জড়তা বা ধর্মের নামে যে-সব অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত তার বিরুদ্ধে তিনি বহুবার লেখনী ধারণ করেছেন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণীয়। আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ায়

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেন নি—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এক সময় যেভাবে হিন্দুসমাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চেয়েছিল সেভাবে তিনি নিজেকে তথা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক বলে কল্পনা করতে পারেন নি। আদম স্থমারির সময় তিনি ব্রাহ্মদের হিন্দুব্রাহ্ম বলে পরিচয় দিতে অনুরোধ করেছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতির কথা স্মরণ করে তিনি একই জাতীয় সংস্কৃতিকে উদ্‌বুদ্ধ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু-মুসলমান হিন্দু-খ্রীষ্টান এই ধরণের সংজ্ঞায় অভিহিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর অনুরাগ তাঁর এই চিন্তাটির মূল। পাছে হিন্দু সংস্কৃতি বা ভারতীয় জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রাহ্মধর্ম একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবকে ব্রাহ্মোৎসব না বলে ব্রহ্মোৎসব নামে অভিহিত করেছিলেন।

(হিন্দুসমাজে ধর্মের বিভিন্ন রূপ যুগে যুগে দেখা গেছে। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি হিন্দুধর্মের একটি অভিব্যক্তি রূপে কল্পনা করেছেন। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে এমন একটা সর্বজনীনতা আছে যা দেশকালের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মাদর্শটিকে বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে হিন্দুধর্ম বলেই তার পরিচয় দিতে উৎসুক হয়েছিলেন।) বহুবিধ কারণে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সব গ্লানি বা দুর্বলতা দেখা দিয়েছে সেগুলো দূরীভূত করে হিন্দুধর্ম তার বিশুদ্ধ মূর্তিতে সর্বত্র শ্রদ্ধালাভ করুক এই ছিল তাঁর একান্ত কামনা।

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে সাধারণত ধর্মবিষয়ক কোনো বিতর্কে প্রবেশ করতে চান নি। তবে কোনো কোনো সাময়িক ঘটনায় তিনি মতামত দিয়েছেন। ব্রাহ্মপ্রভাবান্বিত সিটি কলেজের ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কলেজের হোস্টেলে সরস্বতী পূজা করবার দাবি জানিয়ে অনশন ধর্মঘট করলে তিনি সেটাকে অন্যায়

বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। রামচন্দ্র শর্মা নামক জনৈক জয়পুরী ব্রাহ্মণ কালীঘাটে জীববলি বন্ধ করবার জন্য অনশন করলে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি যে কেবল ব্রাহ্মধর্মের মতবাদে প্রভাবিত হয়েই মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা নয়, এ বিষয়ে তাঁর একটা সুগভীর চিন্তাও ছিল। প্রতিমাপূজাকে তিনি নিছক পৌত্তলিকতা বলে উড়িয়ে দিতে চান নি, এ সম্পর্কে তিনি ধীরভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে প্রতিমাপূজা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে দুটি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধারযোগ্য।—

"যাঁরা বলেন, প্রতিমাপূজার আবশ্যকতা আছে তাঁরা নানা ভিন্ন দিক থেকে বলেন। কেউ বলেন, আমাদের মন সীমাবদ্ধ; এইজন্য মানুষ মাত্রেরই পক্ষে প্রতিমাপূজা ছাড়া গতি নেই; কেউ বলেন, যারা দুর্বলচিত্ত, কনিষ্ঠ অধিকারী তাঁদের এই সোপান দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় নেই, অতএব তাঁদের খাতিরে এ সমস্তকে সহ্য করে চলতে হয়; আবার আজকাল অনেকে বলেন, এই প্রতিমা-পূজাই সকল উপাসনার শ্রেষ্ঠ—এইটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার চরম।··

আমরা ধর্মকে আমাদের নিজের চেয়ে নেমে যেতে দিয়েছি; আমরা কেবল বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারিনে; বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্য নয়, অতএব আমাদের পক্ষে এই সব মুগ্ধ কল্পনাই ভাল, এমনি ধর্মকে সহজ করতে গিয়ে যে তাকে কেবলি নীচু করছে, তার আর উদ্ধারের উপায় নেই। ধর্মকে যে উপরে রেখেছে ধর্ম তাকে উপরে টেনেছে, কিন্তু হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্মই দরকার। এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত করে নেবে যেতে দিয়েছে।" [২০শে আষাঢ় ১৩১৭, প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ]

"আমাদের দেশে প্রচলিত পূজার্চনা বিধির মধ্যে এমন সুগভীর তত্ত্ব আছে যা বহুমূল্য। আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন, আধ্যাত্মিক গরিমায় তাঁরা আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ সমস্তই আমি মানি, কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে যায়। আমাদের ধর্মের মধ্যে এত মূঢ়তা! নিজের শক্তিকে এমন চারিদিক থেকে পঙ্গু করা, নিজের বুদ্ধিকে এমন এ কান্তভাবে অন্ধ করা। যে ধর্ম আমাদের উপরের জিনিস, উপনিষৎ যাকে 'ক্ষুরধার নিশিত' দুর্গম বলেছেন, যা লাভ করবার জন্যে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সচেষ্ট রাখা আবশ্যক, তাকে আমরা যথেচ্ছামত সস্তা করে নিয়েছি এবং ক্রমাগত বলে এসেছি আমরা পারিনে, এই সব ধারণা আমাদের সাধ্যের অতীত, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমাদের পক্ষে সত্যের বিকারই একমাত্র অবলম্বনীয়। নিজেকে দুর্বল বলে স্বীকার করে নিজের ধর্মকে যদি খাটো করি তবে কে আমাদের বল দেবে? ধর্মকেই যদি নীচে ফেলি তবে আমাদের উপরে তুলবে কিসে?"
[২৯শে আষাঢ় ১৩১৭, প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ]

নিম্নাধিকারীর মুখ চেয়ে রচিত বলে রক্ষাযোগ্য-- এই যুক্তি দেখালেও ধর্মের কল্পনাকে এইভাবে বুদ্ধির মাপে খাটো করলে চলে না। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাটি রামমোহনের চিন্তারই পরিণতি। প্রতিমাবিশেষের পূজার মূলে হয়তো কোনো বিশেষ কল্পনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই বিশেষ কল্পনাটি বিলুপ্ত—বাহ্য আচার অনুষ্ঠান প্রবল হয়ে উঠে আর সব-কিছুকে ঢেকে ফেলেছে। বাইরে থেকে প্রতিমাপূজাকে একটা ভাবকল্পনা হিসাবে দেখলে তাকে হয়তো মনোহারী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রত্যহের জীবনচর্যায় এর মূল্য যে কতটা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা

নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলে না মনে করা হয় তা হলেই মুস্কিল থাকে না। তাঁকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্ন দ্বারা নিজের মনে স্থির করে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে এ কথা আমি মনে করিনে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে। ঠাকুরের বিবাহ দেওয়া, তাঁকে খাওয়ানো পরানো, ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদি নিরতিশয় খেলা। ঠাকুরকে খাওয়াতে পরাতে হয় বটে, কিন্তু সে হচ্ছে যেখানে তিনি খান পরেন—সে কেবল মনুষ্যেরই মধ্যে, জীবের মধ্যে। তাঁর সেবা তিনি সেইখান থেকেই সত্যভাবে গ্রহণ করেন, অন্য কোনো রকমে দিতে গেলে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া হয়।" [৫ই চৈত্র ১৩১৮, প্রবাসী ১৩৩৪ মাঘ]

প্রতিমাপূজা যে একটা মোহে পরিণত হয়েছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এর মূলে আমাদের যে দুর্বলতা আছে তাঁর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "ভাল করে ভেবে দেখো কালক্রমে এ মোহ এল কেন? তার কারণ, এই বিশ্বাস মনে আছে যে ঠাকুরকে অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে একটা সত্যকার কাজ করা হল। তা ছাড়া ঠাকুরের স্থান সর্বাগ্রে, জীবের স্থান তার পরে, অতএব বড় কর্তব্যটাকে সস্তায় সেরে বড় পুণ্যটাকে লাভ করা হয়ে গেলে বাকিটা বাদ দিতে ভয় হয় না, দুঃখ হয় না—বিশেষত বাকিটাই যেখানে দুষ্কর। জাতকুল দেখে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা সহজ, লোকে তাই করে,—সেই ভক্তি অধিকাংশ স্থলে অস্থানে পড়ে নিষ্ফল হয়; যথার্থ ব্রহ্মণ্য গুণে যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যে জাতেরই হন, তাঁকে ভক্তির দ্বারা সত্যফল পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ নয় এইজন্যই অস্থানে ভক্তির দ্বারা কর্তব্যপালনের তৃপ্তিভোগ করা প্রচলিত হয়েছে।

আমাদের দেশে মানুষ সর্বত্রই বঞ্চিত, উপেক্ষিত; মানুষের প্রতি কর্তব্য যদি বা শাস্ত্রের শ্লোকে থাকে আচারে নেই; তার

প্রধান কারণ ধর্মসাধনায় মানুষ গৌণ। সস্তায় পাপমোচনের ও পুণ্যফল পাবার হাজার হাজার কৃত্রিম উপায় যে দেশের পঞ্জিকায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে অজস্র মেলে সে দেশে বীর্যসাধ্য সত্যসাধ্য ত্যাগসাধ্য বুদ্ধিসাধ্য ধর্মসাধনা বিকৃত না হয়ে থাকতেই পারে না। যেটা অন্তরের জিনিস, যেটা চৈতন্যের জিনিস সেটাকে জড়ের অনুগত করে যদি নিয়ত তার অসম্মান করা হয় তবে আমাদের অন্তরপ্রকৃতি জড়ত্বে জরাগ্রস্ত হতে বাধ্য।...

...যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারাজীবন অত্যন্ত শুচি হয়ে কাটালেন, ভাবরসে নিমগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা তো নিজেরই পূজা করলেন—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রসসম্ভোগ নিজেদের মধ্যেই আবর্তিত, আর মুক্তি বলে যদি কিছু তাঁরা পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ।" [১২ই আষাঢ় ১৩৩৮, প্রবাসী ১৩৩৯ বৈশাখ]

আচারকে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে থাকার ফলে হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা ঘোর তামসিকতা যে সঞ্চারিত হয়েছে—এটা রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের যে তাৎপর্য পূর্বকালে কোনো সময় হয়তো ছিল—বর্তমানে তা বিস্মৃত, কালান্তরের ফলে তা নিষ্প্রয়োজনও বটে। মূলের আদর্শ বা উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আমরা কেবল অনুষ্ঠানটুকুই সম্বল করেছি।

রবীন্দ্রনাথ বর্তমান কালের মন্ত্রজপকেও নিরর্থক বলেছেন। 'অচলায়তন' নাটকের মধ্যে মন্ত্রজপের অর্থহীন দিকটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এইজন্য অনেকে রবীন্দ্রনাথকে মন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী বলে অভিযোগ করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রে বিশ্বাসী, যদি সে মন্ত্র চিত্তের উদ্বোধনের সহায়ক হয়। উপনিষদ্ বা বেদের বহু মন্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। অভিযোগের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, "মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে.

কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা।...কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন ব্যাপার হইতে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করা হয়—মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায় তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে? কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে সে তখন আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না—তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে; তখন চিত্তকে মুক্ত করিবে বলিয়া যাহা রচিত, তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে।" [উদ্ধৃতি—রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃষ্ঠা ২৪৮]

আমাদের দেশে ধর্মের নামে আচার-অনুষ্ঠানের যে অচলায়তন গড়ে উঠেছে, এই নাটকে তাকে ভাঙবার কল্পনা আছে। কিন্তু সেই ভাঙাটাই শেষ নয়—তার পরে গড়বার কথাও আছে। শুদ্ধমাত্র আচার-অনুষ্ঠান আর অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানচর্যার জন্য অচলায়তনে মুখ্য পুরুষ মহাপঞ্চকের জীবন অসম্পূর্ণ। আবার কর্মমাত্রনির্ভর শোনপাংশু বা ভক্তিমাত্রনির্ভর দর্ভকদের জীবনও সম্পূর্ণ নয়। নাটকের পরিণতিতে এই তিনটিকে মিলিয়ে নূতন জীবন গড়ে তোলবার আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দেশব্যাপী অজ্ঞান আর তামসিকতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের নামে অনাচার বা কদাচারও যে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তান্ত্রিকতার নামে বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রচলিত হিন্দুধর্মের দুর্বলতাগুলো এইভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন তার মূলে ছিল ধর্মকে বিশ্বজনীনরূপে

দেখবার প্রয়াস। ধর্মকে কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে তাঁর চিত্ত রাজি নয়। 'সঞ্চয়' গ্রন্থের 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন-একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো-একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কাজের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে ও ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবল তাল কাটিতে থাকিবে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮, পৃষ্ঠা ৩৫০]

এ প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেনের উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, "এখানেই রবীন্দ্রনাথের নবধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। সেধর্ম কোনো নির্দিষ্ট কাল বা সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পত্তি নয়, তা সর্বকালের এবং সর্বমানবের সম্পদ; তা কোনো শাস্ত্র-নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডি-চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত নয়; মানুষের স্বাধীন বিচার ও মুক্ত জ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ থাকবে না, জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলার শক্তি তার থাকবে; চিন্তা কর্ম ও হৃদয়বোধ জীবনের সর্ববিভাগেব মধ্যেই সে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে। এই সামঞ্জস্য রক্ষাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মের প্রধান কথা। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য। ধর্ম হবে জ্ঞান ও সত্য-নিষ্ঠ; যথার্থ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে ধর্ম জীবনকে সত্য-পথের নির্দেশ দিতে পারে না। কিন্তু নিছক জ্ঞানের মধ্যে প্রেমের বা কর্মের প্রেরণা থাকে না। প্রেমই জীবনকে কল্যাণের পথে প্রেরণা দান করে। কিন্তু জ্ঞান-ও কর্ম-হীন প্রেম নিষ্ফল ভাববিলাসিতায়

পর্যবসিত হয়। আর প্রেমহীন কর্ম মানুষকে চালনা করে হিংস্রতার পথে এবং জ্ঞানহীন কর্ম তাকে নামায় পশুত্বের স্তরে। আমাদের চিরাগত ধর্ম-সমূহ এই সামঞ্জস্যের অভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে নানা সংস্কারের বিকার তো ঘটেছেই তা ছাড়া যাথানুপাতিক সামঞ্জস্যের অভাবেও প্রেরণাশক্তি হারিয়েছে। উপনিষদের ধর্মে জ্ঞান ও সত্যের উজ্জ্বলতা আজও জগতের বিস্ময়স্থল, অবশ্য তাকেও আধুনিক জ্ঞানের উপযোগী করে নেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তাতে প্রেমের প্রেরণা ও কর্মের নির্দেশ খুবই দুর্বল। তাই তা নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানের স্থান উচ্চে, তাতে মৈত্রী-করুণার প্রেরণাও দুর্বল নয়। তারই ফলে বৌদ্ধধর্ম একদা বিশ্ববিজয়ে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তার জ্ঞানের দিক অবাস্তবতার পথে অগ্রসর হয়ে ওই ধর্মকেই নিষ্ফলতার মধ্যে ঠেলে দিল। বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের স্থান উচ্চে, জ্ঞানের প্রেরণা দুর্বল। তাই ভাববিলাস ও রসবিকারের মধ্যেই তার অবসান। খ্রীষ্টানধর্মে মৈত্রী করুণা প্রভৃতি হৃদয়বোধের উৎকর্ষ ঘটেছিল খুবই; তাতে এককালে বহু মানুষকেই এক করেছিল। কিন্তু তাতে জ্ঞানের প্রভাব বড়ই ক্ষীণ। তাই আধুনিক শিক্ষিত মনের কাছে স্বীকৃতি পায় না; ফলে খ্রীষ্টানধর্মের মহত্ত্বের দিকটাও আজ অবজ্ঞাত।...

রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন যাতে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে, যাতে উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী-করুণা এবং বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টধর্মের প্রেমভক্তি একত্র সমন্বিত হয়েছে, অথচ যা সর্বতোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী। সে মন একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ, আচারপদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী।" [রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ শ্রাবণ আশ্বিন]

. রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধর্মমতের সার্বভৌমিক দিকে আকৃষ্ট

হয়েছিলেন। যেখানে যেখানে সমন্বয়ের সম্ভাবনা আছে সেখানে তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন। প্রত্যেক ধর্মমতের মধ্যে একটা দিক নিতান্তই সাম্প্রদায়িক—রবীন্দ্রনাথ সেটিকে উপেক্ষা করেছেন; অপর দিকটি সর্বজনীন, তিনি তার মধ্য থেকে ধর্মের মূল সুরটি আকর্ষণ করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগার উপর নির্ভর করেই যে বিশেষ ধর্মকে বড়ো বলেছেন তা নয়, তিনি বিশ্বমানবের হয়ে ধর্মের একটা আদর্শ সৃষ্টি করতে উৎসুক হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের হিন্দুধর্মে প্রতিমা-পূজার স্থান নাই, জাতিভেদ থাকিতে পারে না, শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে। তাঁহার মতে সত্যের দিক হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই যদি ধর্মের অঙ্গ হয়, তবে সর্বধর্মের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ ও মানবীয়, সকল লোকের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়—তাহাই হিন্দুধর্মের অঙ্গভূষণ হইবে। রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দুধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম অর্থাৎ সর্বলোকেব আশ্রয়-স্থল; এ কথা যদি সত্য হয় তবে হিন্দুধর্মের সহিত ইসলাম বা খ্রীষ্টীয় ধর্মের মূলতত্ত্বের বিরোধ-কণ্টক তো একেবারেই উৎপাটিত হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্মমত বলিতে রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকেব ভাবুক সমাজের ধর্মমতের কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা খ্রীষ্টান ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্মরূপেই দেখিতে প্রয়াসী। ইসলাম শুরু হইতে মানুষের ভেদকে ঘুচাইয়া দিয়াছিল; তাহাকে নামে, ভাষায়, বেশে, ভূষায় আহারে বিহারে শিল্পে সাহিত্যে ধর্মসাধনায় একটি পরিপূর্ণ একীকরণের রূপদান করিতে চাহিয়াছিল; uniformity দ্বারা unity বা ঐক্য আনিবার চেষ্টায় বহুল পরিমাণে ইসলাম কৃতকার্যও হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হওয়া মানবমনস্তত্ত্বের দিক হইতে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মধর্ম তথা হিন্দুধর্মকে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা উদারতম মানবতার ধর্ম।" [রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃষ্ঠা ২৬২]

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা

যায় যে ভারতবর্ষে সুদূর অতীত কাল থেকেই বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয় হয়েছে। প্রাচীন আর্যরা এ দেশের তৎকালীন অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতি বা ধর্মবোধকেও আত্মসাৎ করেছিলেন। বৈদিক যুগের কর্মকাণ্ড আর আরণ্যক বা বৌদ্ধ যুগের জ্ঞানকাণ্ডের মূলে আর্য ভাবনা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীসাধনা বা পরবর্তীকালের ভক্তিবাদ অনার্য চিত্তের দান। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মতো আর্য সভ্যতা এ দেশের পূর্বতন সভ্যতাকে বিনাশ করে নি, বরং 'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া' বিভেদ ভুলে একটি বিরাট চিত্ত জাগিয়ে তুলেছে। বর্তমানে হিন্দুধর্মের মধ্যে এত পরস্পরবিরোধী মতবাদ দেখা যায় যা অন্য কোনো ধর্মে অসম্ভব। অদ্বৈতবাদ থেকে আরম্ভ করে ঘেঁটুপুজো পর্যন্ত সবই হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বলে সাধারণের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মধ্যে যে মূঢ়তা আছে তার কারণ অন্যত্র হলেও হিন্দুধর্ম বা হিন্দু সংস্কৃতি যে সব-কিছুকেই স্থান দিয়েছে এটা স্বীকার করতেই হয়। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে বা 'ভারততীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঐক্যের আদর্শের জয়গান করেছেন।

'পরিচয়' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন কালে আর্য-অনার্যের বিরোধ যে কী ভাবে মিলনে পরিণত হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে অনার্যসমাজ আর্যসমাজের মধ্যে একেবারে ঢুকে পড়ে। এরই প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ্য, সংস্কৃতি পদে পদে বন্ধন পদে পদে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকেই পাকা করে তুলে মানুষের চিত্তকে শক্তিহীন, অসাড় করে দিয়েছে। আমাদের ধর্মচেতনায় যে জড়তা দেখা যায় তার মূল এইখানে। এর পরে বহু সাধক আবির্ভূত হয়ে ধর্মের এই সব বাহ্য আবর্জনা দূর করে অন্তরের সত্যকে আবিষ্কার

করতে অগ্রসর হয়েছেন, 'লোকাচার, শাস্ত্রবিধি ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে' করাঘাত করে ভারতকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনের আদর্শকে স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত—সে এমন কথা যদি বলে যে, যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুষিব তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তি ক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকৃষ্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্বলের জন্য দুর্বলতা, অনার্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য জোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল ও বীর্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্রয় উচ্চের প্রতি তাহাই বঞ্চনা ;—কখনো তাহাকে ঔদার্য বলা যাইতে পারে না ; ইহাই তামসিকতা—এবং এই তামসিকতা কখনোই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮, পৃষ্ঠা ৪৫০-৫১]

যে ধর্ম মানুষের চিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করবে সেই ধর্ম মানুষের মনে এমন মোহ সঞ্চার করে যে স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে তাকে বাইরের কাজে লাগাবার প্রয়াস দেখা যায়। আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তার একটি নিদর্শন। এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানের যে বিরোধ বিংশ শতাব্দীর প্রায় সুরু থেকেই দেখা দিয়েছে তা ধর্মাদর্শের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিয়ে নয়। রাষ্ট্রগত অধিকার নিয়ে, মূল স্বার্থকে অবলম্বন করে এই দুই ধর্মের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, যে বিরোধের মূল সমাজে ধর্মের উপর তাকে স্থাপনা করা হয়েছে। ধর্মের নামে মাতিয়ে তোলার প্রয়াসই এখানে স্থান পেয়েছে—বস্তুত উদ্দেশ্য যা তা ধর্ম থেকে বহু দূরে।

ধর্মের দোহাই দিয়ে ঐক্যবদ্ধতার চেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার

করেন নি। তিনি বলেছেন, "মানুষ বলে মানুষের যে মূল্য সেটাকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়াই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?" [হিন্দু-মুসলমান, প্রবাসী ১৩৩৮ শ্রাবণ] —হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গার খবর শুনে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, "এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ বোঝা যায়। আজ মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম, খাঁটি আস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে। নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্মবিকারকে দাহ করা ছাড়া, একেবারে নূতন করে আরম্ভ করা ছাড়া আর কী পথ আছে বুঝতে তো পাচ্ছি নে।" [ধর্ম ও জড়তা, প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ়]

'ধর্মমোহ' কবিতায় এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিরুদ্ধে, ধর্মকে এই ভাবে বাহ্য উপায়-সাধনের অস্ত্ররূপে প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে।

…বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
  পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
  আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা,—
দেবতার নামে এযে শয়তান ভজা।…

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।
  যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
  ভাঙো, ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

প্রত্যেক দেশেই ধর্মমোহ কিছু-না-কিছু পরিমাণে দেখা দিয়েছে। ধর্ম এক একবার জাতির জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বটে কিন্তু তার ঘোর প্রতিক্রিয়ারও অভাব হয় নি।" "ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে, তার সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মবিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্বেকার ফরাসী বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত।

নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্মূলিত করে নি, কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ-ধর্মের আদি প্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহঙ্কার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সঙ্কীর্ণ করেছে—সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়,—মেরেছে প্রাণে মনে বুদ্ধিতে শক্তিতে,—মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে।" [হিন্দু-মুসলমান, প্রবাসী ১৩৩৮ শ্রাবণ]

অন্ধ সংস্কার থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য অনুরূপ প্রয়াস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দের বহু চিন্তার মধ্যে মিল আছে। কিন্তু প্রায় সমকালে জন্মগ্রহণ করলেও এঁদের মধ্যে মিলনের অবকাশ হয় নি। বিবেকানন্দের রচনায় রবীন্দ্রনাথের উল্লেখমাত্র নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দকে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সাধনার মিলনসাধক বলেছেন এই মাত্র। ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে।

কিন্তু যাঁর ধর্মবিজয় সে যুগে ভারতবর্ষের সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাঁর সম্পর্কে তাঁর এই স্বল্পভাষণ সত্যই বিস্ময়কর।

সম্ভবত বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসের আদর্শ গ্রহণ আর প্রচার করেছিলেন তাকে স্বীকার করতে পারেন নি বলেই রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে নীরব। এদেশে বা ইউরোপে মধ্যযুগে যে সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচলিত হয়েছিল তাকে তিনি জীবনবিমুখতা বলে অস্বীকার করেছেন। 'চিরকুমার সভা' নাটকে কৌমার্যব্রতীদের প্রতি তাঁর সকৌতুক দৃষ্টিপাতও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেবল স্বকীয় জীবনপ্রীতি বা ভারতবর্ষের চতুরাশ্রমের আদর্শের প্রতি অনুরাগের জন্যই নয়, আধুনিক জীবনদৃষ্টির জন্যই তিনি সন্ন্যাসকে খুব বড়ো স্থান দেন নি। এইজন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করে নি। রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসবের সময় 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা' বলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেও বা এই উপলক্ষে আহূত সর্বধর্ম-সম্মেলনে ভাষণ দান করলেও রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে জীবনে বরণীয় বলে স্বীকার করেন নি।

বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের পার্থক্য সম্পর্কে প্রভাতকুমার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সমষ্টিমুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তক ব্রাহ্মসমাজ। অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে সমষ্টিমুক্তির যে বাণী প্রচার করিলেন স্থিরবুদ্ধিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহা জনসেবারই বাণী, জনমুক্তির নহে। কারণ আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া যথার্থ জনমুক্তি হয় না। সন্ন্যাসীরা সেবার জন্য যতটা উদ্‌গ্রীব, সংস্কারের জন্য ততটা নহেন। সেইজন্য সেবাধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী প্রচার করিয়াও তাঁহারা কোনো প্রকার 'কুসংস্কার' দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন না। অদ্বৈত দর্শনে পাপও নাই, সংস্কারের 'সু' 'কু'ও নাই; সুতরাং সংস্কার প্রয়াস নিরর্থক। এ

ছাড়া মানুষ যে বিভিন্ন বর্ণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা তো ব্যক্তি-বিশেষের কর্মফলপ্রসূত, সুতরাং প্রাক্তনের সহিত যুক্ত। যাহা পূর্বজন্মার্জিত তাহার সংস্কার সম্ভবে না; অতএব দরিদ্রনারায়ণের সেবাই প্রয়োজন—সংস্কারের নহে। সেবার দ্বারা সেবিতের দুঃখ-মোচন ও সেবকের পুণ্য অর্জন হয়।

কিন্তু সেবাধর্ম (relief) আমাদের মতে, একহিসাবে নঙাত্মক বা অভাবাত্মক কর্ম। কারণ যাহাকে সেবা করা হয় তাহার চিত্ত সেবার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয় না। সাময়িকভাবে সে বস্তুগত সাহায্য লাভ কবিয়া সাময়িকভাবেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় মাত্র—সমস্ত বিষয়টা একটা স্থূল বাস্তব জগতেই (physical plane) থাকিয়া যায়।

সংস্কারকর্মে (reform) সেবিতের চিত্তকে স্পর্শ করা যায়, বাহিরের সহিত তুলনা দ্বারা তাহার আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করাও সম্ভব। ইহার প্রেরণা বাহিরের, ইহার ফল বাহ্যত প্রকাশ পায়, এবং সাময়িকভাবে তাহা কার্যকরীও হয়। সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার ক্ষীণ বাণী মানুষের চিত্তে democracy-র চেতনা আনে বটে কিন্তু সে বাণী দুর্বল সংস্কারের মূর্তিমাত্র—যথার্থ বিপ্লবের (revolution) রূপ গ্রহণ করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ সমষ্টির মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তবে তাহা সেবাপন্থীদের হৃদয়ালুতার পথ বাহিয়া বা সংস্কারকদের শুষ্ক কর্তব্যবোধের পথ বাহিয়া চলে নাই। তিনি মানুষের পরম শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তাহার আত্মসম্মানের ও আত্মশক্তির চেতনা সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজের সেবায়, নিজের সংস্কারে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে—ইহাই হইল কবির বাণী। সেইজন্য কবি সমাজ সংস্কার করিতে নামেন নাই, আর্তের ত্রাণের জন্য সমিতি স্থাপন করেন নাই, তিনি সমগ্র মানুষটি জাগ্রত করিবার জন্য যে বাণী প্রচার করেন ও কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহা হইতেছে পরিপূর্ণ মানবতার

ধর্ম,—লৌকিক ধর্মমত ও ধর্মজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা নহে। কর্মের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের বাণীকে নব-সংগঠনের (re-construction) বাণী বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জীবনশিল্পী বলিয়া সেই দৃষ্টিতে তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন। বিংশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' কাব্যে যে বাণী প্রচার করিলেন তাহা সমগ্র মানবাত্মার মুক্তির বার্তা, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' এই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। সমগ্র মানবাত্মাকে জাগাইবার এ বাণী।" [রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃষ্ঠা ২-৩]

রবীন্দ্রনাথ যে একটি সর্বজনীন ধর্মের আদর্শে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এর মূলে তাঁর বিশ্বমানবতার বোধটি লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাকে বৃহৎ মানব-সমাজের একজন বলেই গ্রহণ করেছেন। কোনো মানুষকে মানব-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না—মানবসমাজের সঙ্গে তার জীবন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তার ব্যক্তিগত পাপপুণ্যের দায়ও মানবসমাজেরই। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে কোথাও ভালো কোথাও মন্দ হতে পারে, কিন্তু তার প্রভাব সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত। পৃথিবীতে কোথাও অন্যায় বা অবিচার হলে সকলকেই তার ফলভোগ করতে হবে। বিশ্বমানবের বৃহৎ পরিবেশেই মানুষের অস্তিত্ব।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে 'সোঽহং' তত্ত্বটির আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমনের সঙ্গে ব্যক্তিমনের ঐক্য কল্পনা করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে, সেই সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রও আছে—রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই বোধটি একাধিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বমনের সঙ্গে ব্যক্তিমনের যেখানে বিচ্ছেদ সেখানে আত্মকেন্দ্রিক সাধনা হয়তো সম্ভবপর। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যেখানে বিরোধ সেখানে মানবধর্মই

সংকুচিত। যথার্থ সত্য সর্বজনগ্রাহ্য—কোথাও তা বেধে যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে কবি রজ্জবের বাণী উদ্ধার করেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ
না মিলৈ সো ঝুঁট।

সব ধর্মের মধ্যেই এমন অনেক জিনিস আছে যা বিশ্বসত্যের সঙ্গে মেলে না। প্রত্যেক ধর্মের আদিতে বিশ্বসত্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রমে মত আর প্রথা ধর্মকে জটিলতর করে তুলে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটিয়ে দেয়। সোঽহং-তত্ত্বটি সেখানে আবৃত হয়ে থাকে। বিশ্বসত্যের সঙ্গে ঐক্যসম্বন্ধের উপরেই সোঽহং-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা।

এই তত্ত্বটি সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত তা খণ্ডন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেশে এমন সকল সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা সোঽহং তত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানব-প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে-অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকে নিয়েই আছেন, তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জিত সুতরাং তার মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই।" [মানুষের ধর্ম, পৃষ্ঠা ৮১]

সংসারের প্রতি কবি বিমুখ কারণ তাতে মানবধর্মের পরিপূর্ণ প্রকাশ হতে পারে না। মুমুক্ষুর কাছে জগৎসংসার তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে কিন্তু সেই জগৎকে উপেক্ষা করে শুদ্ধমাত্র অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে একটা ঘোরতর ব্যর্থতা বর্তমান। বহুকাল থেকে নিছক অধ্যাত্মচর্চাকেই আদর্শ বলে মেনে নেওয়ায় ভারতবর্ষের জীবনে যে একটা তামসিকতা এসেছে তা তিনি অনুভব করেছেন।

এই তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা বলে ভুল করায় আমাদের জাতীয় দুর্গতি ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে এ কথা বলেন নি; নিছক কর্মচর্চা বা নিছক অধ্যাত্মচর্চা যে মানুষের জীবনকে ব্যর্থ করে দেয় তাঁর এই ভাবনাটির মূল ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে হ বিদ্যামুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯

অবিদ্যার উপাসনার ফল অন্ধ তম, শুদ্ধ বিদ্যাচর্চার ফল ঘোর-তর তম। নিছক কর্মের উত্তেজনা হানিকর, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা আরও হানিকর। কেবলমাত্র কর্ম বা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতা—এইভাবে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করলে মানবধর্ম পালন করা হবে না। দুটোকেই গ্রহণ করতে হবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১

কর্মব্রত মানুষের সাধনার গোড়াকার কথা—তার শেষ কথা উদ্‌বৃত্তের সাধনা। প্রথমে তাকে জীবনের দাবি মেটাতে হবে, তা না হলে তার আত্মার সাধনা নিষ্ফল হবে।

ধর্মসাধনা যে মানুষেরই জীবনসাধনা এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার মূলে বর্তমান। সাধনাকে মানুষের দিক থেকে সরিয়ে এনে যদি অন্য-কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় তাহলে তা মানুষের ধর্ম হবে না। মানুষকে বাদ দিয়ে যে-সাধনা তাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট—"যিনি সর্ব-জগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও। এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত আমার মন যে-সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে

ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে,—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে-কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য-কিছু থাকা-না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন?” [পৃষ্ঠা ১১৮-১৯]

এই মানবধর্মবোধ তাঁর বিশ্ববোধেরই অঙ্গীভূত। এই বিশ্ব-বোধ আন্তর্জাতিকতা নয়। আন্তর্জাতিকতা বাইরের জিনিস, বিশ্ববোধ অন্তরের ধন। তিনি এমন কোনো ধর্ম প্রচার করতে চান নি বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে অবিরোধ যার মূল কথা। ‘সবকো সম্মতি দে ভগবান’—এ প্রার্থনা তাঁর নয়। বাইরের একতা নয়, অন্তরের ঐক্যবোধ তাঁর লক্ষ্য। তাঁর ধর্মচিন্তায় এমন একটা আদর্শ ফুটে উঠেছে যা বিশ্বমানবের অন্তরের সায় পাবে। বিভিন্ন ধর্মের সাধারণ তত্ত্বগুলো নিয়ে একটা সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মাদর্শ প্রবর্তন করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না—তিনি ধর্মসংস্কারক বা ধর্মনৈতিক ঐক্যসাধক ছিলেন না। তাঁর ধর্মভাবনা তাঁর আন্তরসত্তার সৃজনক্রিয়ার ফল। তিনি ধর্মনায়ক না হয়ে কবি হওয়ায় এমনটি সম্ভবপর হতে পেরেছে। কবির কাব্য যেমন সকলে গ্রহণ করতে পারে, তাঁর ধর্মচিন্তাও তেমনি সকলে গ্রহণ করতে পারে—তাঁর ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে সব ধর্মমতের মানুষের স্থান আছে। তাঁর ধর্মচিন্তা একতা-সাধক নয়, তা মিলনভূমি।

আধুনিক জীবনে এমনই একটি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্মের প্রয়োজন যার মধ্যে আচার বা অনুষ্ঠানের বদলে চারিত্রনীতিকেই বড়ো বলা হয়েছে, যার মধ্যে সাধনার নামে দুরূহ প্রক্রিয়ার বদলে সহজ আত্মবোধ আর ভগবৎপ্রেমকেই মূল রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চিত্তের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তাতে এই রকম একটা ধর্মাদর্শই তার পক্ষে উপযোগী হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিনয়কুমার সরকার বলেছেন, "উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মমিলন—বিশেষভাবে আত্মিক সমঝোতা—অনিবার্য।...যুক্তিনিষ্ঠার প্রভাবে মুসলমান নরনারী হিন্দুদের খুব কাছে এসে পড়বে। যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দুরাও মুসলমানের কাছে যাবে।...হিন্দু-মুসলমানের ধর্মমিলন অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণের ভেতরও যেমন অবশ্যম্ভাবী উচ্চশিক্ষিতের ভেতরও তেমন অবশ্যম্ভাবী।...আমার বিশ্বাস, আমাদের এখনকার আব-হাওয়াতেই হিন্দুমুসলমানের সমবেত বা যৌথ ধর্মের কাঠাম কাজ করছে। সমসাময়িক বঙ্গসংস্কৃতি আর বঙ্গসমাজ এই যৌথধর্ম মেনেই চলছে।...আমি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধর্মগীতগুলার কথা বলছি। এই গানগুলা হিন্দু গানও নয়, মুসলমান গানও নয়। এ সব হচ্ছে বাঙালি স্ত্রী-পুরুষ মাত্রের জন্য ঈশ্বরবিষয়ক স্তোত্র। এ সবকে আমি হিন্দুমুসলমানের যৌথ ভগবদ্‌গীতা সমঝে থাকি। তা ছাড়া আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মোপদেশসমূহ। এই বাক্যগুলা হিন্দুর উপাসনাও নয়, মুসলমানের উপাসনাও নয়। এ সবের ভেতর আমি পাই বাঙালি হিন্দুমুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আত্মবিশ্লেষণ ও পরমেশ্বরভক্তি।" [বিনয় সরকারের বৈঠকে ১, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫]

ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে অনুরূপ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব আছে; বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি সম্প্রদায়নিরপেক্ষ রূপ। কিন্তু কালক্রমে এই ধর্ম একটা মৃতদেহ ধারণ করায় এর প্রসার থেমে গেছে। তা ছাড়া এই ধর্মের মধ্যে জীবনের প্রতি আগ্রহ

তেমনভাবে ফুটে ওঠে নি। ব্রাহ্মসমাজসংস্কারকদের ব্রতের কথা স্মরণ করলে অবশ্য জীবনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টির কথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু জীবনের প্রতি মানবোচিত প্রবল অনুরাগ অথচ সেই সঙ্গে গভীরতর সত্যে উপনীত হবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা এই ধর্মে স্পষ্ট নয়। তার মধ্যে ব্রহ্মের ভাবনা আছে বটে কিন্তু মানবজীবনের জয়গান নেই। অধ্যাত্মসাধনার কাছে বা চরিত্রগত উৎকর্ষ-সাধনের কাছে মানবপ্রকৃতিকে সেখানেও খর্ব করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ভাবনার মধ্যে সুগভীর আর প্রবল জীবনানুরাগ সঞ্চারিত। 'The Religion of an Artist' গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, "I believe that the vision of Paradise is to be seen in the sunlight and green of the earth, in the beauty of human face and the wealth of human life, even in objects that are seemingly insignificant and unprepossessing. Everywhere in this earth the spirit of Paradise is awake and sending forth its voice. It reaches our inner ear without our knowing it. It tunes our harp of life which sends our aspiration in music beyond the finite, not only in prayers and hopes, but also in temples which are flames of fire and stone, in pictures which are dreams made everlasting, in the dance which is the ecstatic meditation in the still centre of the movement."—মানুষের জীবন বস্তুসর্বস্ব নয়—তার মধ্যে একটা সৎ উপাদান আছে। কিন্তু সৎ উপাদানটিই সবকিছু নয়, মানুষের জীবনের মধ্যে তার রূপে রসে সুবিচিত্র প্রকাশ বলেই তা মানুষের কাছে মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ব্রহ্ম

আর মানুষ একই সুরে গাঁথা হওয়ায় তার মধ্যে মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন এমন স্পষ্টভাবে শোনা যায়।

বাস্তবিক পক্ষে মানবতার মূল্যবোধ আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড়ো কথা—ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের মূল্যকে স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ প্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অর্থহীন সংস্কারের ভারে জীর্ণ, বিচারবিমূঢ় ভক্তির আতিশয্যে আবৃত ধর্মকে যথার্থভাবে জীবনভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ধর্ম একদিকে যেমন অসম্ভবকে লাভ করবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন নয়, অপরদিকে তেমনই প্রয়োজনসাধনের উপায়মাত্র নয়, ধর্ম জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের এক প্রান্তে অবস্থিত মন্দির নয় বা তা জীবনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে নি, তা জীবনের মধ্যে সহজভাবে প্রবাহিত—রবীন্দ্রনাথের এই বোধটি আধুনিক জীবনচিন্তায় একান্ত স্বাভাবিক, সংগতও বটে।

এ যুগে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক নাস্তিক বা ধর্মদ্বেষী, কিছু লোক ধর্মের নামে গদ-গদ—কিন্তু মানবসমাজের বড়ো অংশটাই ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহশূন্য হওয়ায় গতানুগতিকতার অনুসরণ করে চলেছে। আধুনিক মননের সঙ্গে প্রাচীন ধর্মের অনেকটাই মেলে না—প্রাচীন ধর্মের সারটুকু গ্রহণ করে অসার বস্তু পরিহার করার শ্রম করতে এই বৃহৎ মানবসমাজ প্রস্তুত নয়—সুতরাং ধর্ম সম্পর্কে বিরুদ্ধতা না থাকলেও তার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহও নেই। তার জীবনের বিচিত্র সাধনার ক্ষেত্র থেকে ধর্ম বাদ পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আধুনিক জীবনে ধর্মের আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস সফল হয়েছে। এদেশে রামমোহন এ বিষয়ে পথিকৃৎ। তিনি জ্ঞানের দৃষ্টিতে শাস্ত্রকে বিচার করে আধুনিক জীবনে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে শাস্ত্রের বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় জীবনই মুখ্য—তা বিচিত্র উপাদানকে গ্রহণ করেছে, যেখানে শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে তার মিল আছে সেখানে তা শাস্ত্রের বাণীকে

অভিনব রসে মণ্ডিত করে উপভোগ করেছে। সব-কিছুকেই ধর্মের রঙে রঞ্জিত করা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নয়। জীবনের মধ্যে নীতিবোধ আর গভীর সত্যানুভূতিকে সহজ করে তোলাই তাঁর ধর্মচিন্তার সার মর্ম।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা প্রচলিত ধর্মের দুটি বিষয়কে পরিহার করেছে। এই দুটি বিষয় ধর্মের দুই প্রান্তবর্তী—একটি তাত্ত্বিকতা, অপরটি সাধনপ্রণালী। পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের অনুশীলন আর আলোচনাই সব চেয়ে বেশি করে হয়েছে। এই সুপ্রাচীন ধর্মে তাত্ত্বিকতা আর সাধন-ক্রিয়া সম্পর্কে একেবারে বিপরীত কথা স্থান পেয়েছে। ষড়্‌দর্শনের বিভিন্ন শাখায় পরমতত্ত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য অতি সূক্ষ্ম বিষয় সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার হিন্দু-ধর্মের নামে জটিল সাধনপ্রণালীও প্রচলিত। বাস্তবিক পক্ষে এই দুটোকেই সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরর্থক বলা অসংগত হবে না। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় অতি সূক্ষ্ম দার্শনিকতা নেই, কোনো সুনির্দিষ্ট সাধনপ্রণালীও নেই—সেইজন্য তা উৎকট জ্ঞানসাধক বা সংস্কারমূঢ় চিত্তকে হয়তো সন্তুষ্ট করতে পারে না। কিন্তু মানুষের সহজ জীবনযাত্রার সঙ্গে তার যোগ আছে। দার্শনিকতা আর যুক্তিহীন অনুষ্ঠান এই দুটোকেই পরিহার রবীন্দ্রনাথের জীবন-দৃষ্টিরই পরিচয় দেয়।

ধর্মের ক্ষেত্রেও যাঁরা বস্তুবাদী তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাকে ধর্মের কোনো আদর্শ বলে হয়তো স্বীকারই করবেন না। সৎ হওয়া, ঈশ্বরের প্রেমে জীবন ভরিয়ে রাখা—এই ধরনের কল্পনা তাঁদের কাছে সদর্থক কোনো চিন্তা বলে প্রতিভাত নাও হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ধর্মকে নিঃশ্বাসবায়ু-রূপে সহজভাবে গ্রহণ করবার আদর্শ প্রচলিত ধর্মের মধ্যে নেই। ধর্ম বলতে আমাদের চিত্তে যে সংস্কার বা বাসনার উদয় হয় রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় তার মূল্য

যৎসামান্য। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় ভগবৎ-চিন্তামূলক উপাসনা ছাড়া আর কোনো অনুষ্ঠানের স্থান নেই।

আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ধর্মমতগুলির আচার-অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। ভগবৎ-চিন্তায় আর কিছু হোক-না-হোক অন্তরে সৎ ভাব যে আসে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি এই কথাটার প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু কোনো বিশেষ দেবতার পূজায় বিশেষ শক্তি অর্জন করা যায় বা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ ফল লাভ করা যায় এই কথা বিজ্ঞান স্বীকার করে নি। আমাদের দেশের পূজাপার্বণের মধ্যে উৎসবের যে একটা আনন্দ আছে তা সহজবোধ্য—কিন্তু তার মধ্য দিয়ে দৈবী শক্তি বা দৈব প্রসাদ লাভ করা যেতে পারে এই মতটিকে সত্য বলে মেনে নিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি রাজি নয়। বরং বিভিন্ন যুগে সমাজের বিচিত্র গতির ফলেই আমাদের ধর্ম গড়ে উঠেছে, যে-সব জিনিসকে আমাদের ভক্তিপ্রবণ মন সনাতন বলে মনে করে আসছে তার অনেকগুলিই অর্বাচীন, যে সমস্ত অনুষ্ঠানকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করি তার অনেকগুলিই অর্থহীন—আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এই ধরনের সিদ্ধান্ত উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে আমাদের সামনে হাজির করেছে। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে এমন অনেক জিনিস প্রমাণিত হয়েছে যাতে আমাদের প্রচলিত ধর্মের অনুষ্ঠানগুলি যে নিতান্তই সাময়িক সৃষ্টি আর যুগে যুগে তা যে পরিবর্তিত হয়ে আসছে এই বোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে নিরুত্তর। সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে পিছু ফিরতে ফিরতে একদিকে যেমন সে মানুষ থেকে আদি অ্যামিবায় পৌঁছেছে তেমনই এই পৃথিবী থেকে সূর্যে, সূর্য থেকে নীহারিকায়, অবশেষে নীহারিকা থেকে মহাশূন্যে ভাসমান অণুপুঞ্জে পৌঁছেছে। অণুকে, পরমাণুকে বিশ্লেষণ করে শক্তির বিচিত্র লীলা

সে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে বটে কিন্তু তার বেশি কিছু বলতে পারে নি। ধর্মের অনেক বিশ্বাসকেই সে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করতে পারে নি।

ব্রহ্ম যে অমেয়—বেদান্তদর্শনের এই অন্যতম সিদ্ধান্ত সব দর্শনের ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য। সব দর্শনেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনা আছে বটে, কিন্তু তাতে আমাদের তার্কিক মন কতকটা পরিতৃপ্ত হয় এইমাত্র, আমাদের জ্ঞানবৃত্তি তা থেকে যথার্থ সার পদার্থ আহরণ করতে পারে কি না সন্দেহ।

শ্রীঅরবিন্দ বিবর্তনবাদের দিকে দৃষ্টি রেখে জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন এইভাবে বিশ্বের বিকাশের কথা বলেছেন—মানুষ সাধনার বলে অতিমানস লাভ করে অবশেষে দিব্যজীবনের অধিকারী হবে, এই তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী। কিন্তু তাঁর এই উক্তিও অত্যুচ্চ ভাবকল্পনা মাত্র। বস্তুত শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা সকলেই অত্যুচ্চ ভাবকল্পনার অধিকারী—শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে এইখানেই তাদের সাজাত্য।

মোট কথা এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষেব ফলে আমাদেব প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বিপর্যস্ত, অথচ এই বিজ্ঞান আমাদের চিত্তের বিশ্রাম-ভূমি নয়। মানুষেব অন্তর বলে যে একটি জিনিস আছে বস্তুবিজ্ঞান তার হদিশ পায় নি। এই অন্তর মানুষের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ যার তৃপ্তির জন্য মানুষ শিল্পের সাধনা করে, যার স্ফূর্তির জন্য ধর্মেব মতো শক্তির প্রয়োজন। নাস্তিকের আর কোনো কিছুর অভাব হয় না, কিন্তু ভক্তের সুগভীর আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ বললে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু মানুষের অন্তরে যে গভীর একটা আকাঙ্ক্ষা আছে আর সেই আকাঙ্ক্ষা যে উপকরণের সমাবেশে মেটে না একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মানুষের অন্তর যে গভীরতম সত্যকে চায়, যে চরমপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল তার জন্যই মানুষের ধর্মের

উদ্ভব। সত্যবস্তুর সন্ধান না পেয়ে মানুষের ধর্ম অনেক বিকৃত বিষয় বা মিথ্যা উপাদান গ্রহণ করেছে বটে কিন্তু তার জন্য তার অন্তরের সেই সুগভীর আস্পৃহাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাকে আধুনিক মানুষের সেই গভীরতম সত্যানুসন্ধানের একটা প্রয়াস বলা অসংগত হবে না। তিনি যেন আধুনিক যুগের শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আর চিরন্তন মানুষের আগ্রহ নিয়ে মানুষের চরম সত্যের সন্ধান করতে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর ধর্মচিন্তা আধুনিক যুগের মানুষের ধর্মচিন্তারই একটি রূপ—কবির জীবনসাধনা তাকে অপরূপ করে তুলেছে।

আধুনিক মানুষের মধ্যে সংস্কারমুক্তির যে প্রয়াস আছে তা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় সুস্পষ্ট। একসময়ে তিনি তাঁর ভাবী জামাতাকে উপবীত গ্রহণ করানোর জন্য জিদ ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে সেই সময়কার সংস্কারের দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নেই। শেষ জীবনে তাঁর দৌহিত্রীর অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তিনি বার বার সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙেছেন।—প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ প্রেততত্ত্বে আগ্রহশীল এমন কি কিছু পরিমাণে বিশ্বাসীও ছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনায় এই আগ্রহ বা বিশ্বাসের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর রচনা মনস্বিতায় উজ্জ্বল—আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির সঙ্গে কবির ভাবকল্পনা মিশে তাঁকে তাঁর প্রত্যেকটি চিন্তাকে মুক্তার মতো নিটোল আর দীপ্তিময় করে তুলেছে। যা জীর্ণ সংস্কার বা যা অস্পষ্টতার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন তাকে তাঁর লেখনী প্রশ্রয় দেয় নি। তাঁর ধর্মচিন্তায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁর সচেতন অনুভূতির ফল। আপনার অন্তরে কোনো জিনিস উপলব্ধি করে তারপর তিনি সেটাকে প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিমানুষের অনেক-কিছু ভালোলাগা মন্দলাগা থাকতে

পারে, ব্যক্তিমানুষের অনেক দুর্বলতাও থাকে ; কিন্তু ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সেগুলোকে পরিহারই করেছেন। তাঁর রচনাবলীতে কোথাও মননের অসদ্ভাব ঘটে নি—আধুনিক বিচারবুদ্ধিকে তিনি প্রতিপদে স্বীকার করেছেন।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের অবিরোধ আর নীতির মিলন সাধিত হলে জীবন সব দিক দিয়েই সুন্দর আর সুসমঞ্জস হয়ে উঠতে পারে। ধর্মজীবন, নৈতিক জীবন, যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তবজীবন—এই তিনটিই জীবনের খণ্ডাংশ—রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এই তিনটিকে মিলিত করে পূর্ণাঙ্গ জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে উৎসুক হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সৌন্দর্যানুভূতি তথা সৌষম্যবোধ এই সামঞ্জস্য সাধন করেছে। মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি তার অন্য অনুভূতিগুলো থেকে স্বতন্ত্র একটা বিচ্ছিন্ন বৃত্তি নয়—এটি তার জীবনের সব বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত, সুতরাং এর মধ্যে পূর্ণতার সুর আছে। উপনিষদে সৃষ্টির মূলে আনন্দের কথা বলা হয়েছে—এই সৌন্দর্যানুভূতি সেই আনন্দের লাবণ্য—ভিতরে আনন্দরস টলটল করছে। অন্তরে একটা গভীর রসবোধ না থাকলে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগ্রত হতে পারে না। প্রতি মানুষের অন্তরেই এই রসবোধ কিছু-না-কিছু পরিমাণে থাকে—এই বোধটিকে বিকাশের অবকাশ দিলেই জীবন সুষমায় মণ্ডিত হতে পারে। এই অবস্থাতেই ধর্মকে জীবনে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর—নতুবা ধর্মের জন্য জীবনের উপর একটা কৃত্রিম চাপ সৃষ্টি করলে তা একপেশে হয়ে উঠবে। জীবনের সব বৃত্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্মচেতনাও একটা গভীর আনন্দের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হতে হতে আমাদের জীবনকে সব দিক দিয়ে সার্থক আর পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে—এই কথাটি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার মূল সূত্র।

গ্রন্থ পঞ্জী

বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—সমগ্র বাংলা রচনাবলী ও চিঠিপত্র
রামমোহন রায়	—সমগ্র গ্রন্থাবলী
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	—আত্মজীবনী
	ব্রাহ্মধর্ম [সম্পাদিত গ্রন্থ]
	ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	—রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ১ম—৪র্থ খণ্ড
অজিতকুমার চক্রবর্তী	—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	কাব্য পরিক্রমা
	রবীন্দ্রনাথ
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	—রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত
শিবনাথ শাস্ত্রী	—আত্মচরিত
	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ
সুকুমার সেন	—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড
ক্ষিতিমোহন সেন	—দাদূ
	ভারতের সংস্কৃতি
প্রমথনাথ বিশী	রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ ১ম—২য় খণ্ড
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	—রবিরশ্মি পূর্বভাগ ও পশ্চিম ভাগ
নীহাররঞ্জন রায়	—রবীন্দ্র সহিত্যের ভূমিকা ১—২
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	রবি-দীপিতা
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	—ভারতীয় সাধনার ঐক্য
	ত্রয়ী
অরবিন্দ ঘোষ	—দিব্যজীবন [অনুবাদ]

দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ [সম্পাদিত] —উপনিষদ গ্রন্থাবলী

কাজী আবদুল ওদুদ —শাশ্বত বঙ্গ

বিনয়কুমার সরকার —বিনয় সরকারের বৈঠকে [মৌখিক উক্তির অনুলিখন]

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় —রবীন্দ্রদর্শন

অমলেন্দু দাশগুপ্ত —ঋষি রবীন্দ্রনাথ

সাময়িক পত্র —প্রবাসী, বিশ্বভারতী পত্রিকা

ইংরেজী

Rabindranath Tagore —Personality
Sadhana
The Religion of Man
The Religion of an Artist
Letters to a Friend

Evelyn Underhill —An Introduction to Mysticism

Max Muller —From Rammohan to Ramkrishna

Surendranath Dasgupta —Rabindranath Poet and Philosopher

Sasibhusan Dasgupta —Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature.

নির্ঘণ্ট